

প্রথম খণ্ড

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম 'চিরায়ত' সংস্করণ / ঝুলনযাত্রা ১৩৪৪

প্রকাশক/কল্যাণ দে, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩
মুদ্রক/শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস ১/১এ গোয়াবাগান লেন, কলি-৭০০০০৬
ব্লক/টাইপোগ্রাফিক আর্টস, ৫৪/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৭০০০০৯
প্রচ্ছদ/জোছন দস্তিদার

বিশেষজ্ঞের কথা

উনিশশো তিপান্ন সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে স্টেট্ ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবর‍্যাটরি তৈরী হয়। ইন্দো-পাকিস্তানে এই ধরনের ল্যাবর‍্যাটরি প্রথম।

অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কলকাতার এই ফরেনসিক ল্যাবর‍্যাটরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ভারতে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের ল্যাবর‍্যাটরি তৈরী হয়েছে কিম্বা হতে চলেছে।

তিপান্ন সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমার কাছে অনুমতি চেয়ে বসলেন। বিষয়টি এই—ফরেনসিক ল্যাবর‍্যাটরিতে আমরা যে সব বৈচিত্র্যপূর্ণ অপবাধ বিশ্লেষণ করি ও পুলিশী তদন্তে সাহায্য করার জন্য নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সেগুলোর কিছু কিছু কাহিনী আকারে প্রকাশের জন্য তাঁকে অনুমতি দিতে হবে।

জিনিষটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। খুন খারাপির গল্পের আব আমাদের দেশে অভাব কোথায়? শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় প্রমুখ অনেকেই তো ক্রাইম স্টোরী লিখেছেন বা এখনও আরো অনেকে লিখে থাকেন। এব পর আর ঐ একই বিষয় নিয়ে লেখার তেমন কি থাকতে পারে।

কিন্তু দেখছি এ ধারণা ভুল। আমার মনে হয় বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রকাশিত কাহিনীগুলো সত্যিই নতুনত্বের দাবি রাখে। Truth is stranger than fiction. সহরে বা সহরতলীতে প্রতিদিন আমরা যে সব নরহত্যা, আত্মহত্যা, চুরি-ডাকাতি, জালিয়াতী, যৌন বিকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখছি এবং সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি,

তাদের নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে প্রথম বলে মনে হল, তাই দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুরূহ প্রচেষ্টা আমি সমর্থন না করে পারিনি।

ঘটনাস্থলে সংগৃহীত সামগ্রী বিচার বিশ্লেষণ করে অপরাধ ও অপরাধীর স্বরূপ নির্ণয়, এ তো আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। সংবাদ পত্র মারফত জানা চেনা ঘটনাগুলোই যখন সাজিয়ে গুছিয়ে ছাপার অক্ষরে বেরোয় তখন সেগুলো হয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর কাহিনী। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, খুনীর প্রকৃত চরিত্র চিত্রণে, অপরাধের মূল সূত্র আবিষ্কারের রহস্যঘন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্প জীবন্ত।

একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জগতে যা ঘটে তার হুবহু ছবি যদি তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে সংবাদ—যা প্রতিদিন খবরের কাগজে আমরা পড়ি। কিন্তু সংবাদ পরিবেশন করা তো এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তাই শ্রী মুখোপাধ্যায় অপরাধের নানাদিক আলোচনা করে অপরাধীর অন্তর্নিহিত মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে সেই বাস্তব ঘটনাগুলোকেই মনোজ্ঞ করে পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কাহিনীগুলো থেকেই ভাবতে ফরেনসিক ল্যাবর‍্যাটরির কাজকর্ম ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধেও বেশ খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে।

তাই আলাদা করে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

স্টেট্ ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবর‍্যাটরি
মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-১২

ডাঃ এস, চৌধুরী
ডিরেক্টর

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

'ফরেনসিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে শুনে খুব আনন্দ হল। গ্রন্থটির প্রথম সংস্কবণ অল্প কয়েক মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হবাব পব কয়েক বৎসব অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তবুও পাঠক সমাজে এর চাহিদা উর্ধ্বমুখী দেখে মনে হয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কবার প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রী মুখোপাধ্যায়েব পরিচয় প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে লিখেছিলাম, তাই এখানে পুনবায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সঙ্কলনের বাস্তব-ভিত্তিক কাহিনীগুলি পত্র-পত্রিকায় ও বেতাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে অত্যধিক সমাদৃত হয়েছে।

জনপ্রিয়তাই বইটিব সাফল্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের লেখনীব শ্রীবৃদ্ধি হোক—তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংযোজনে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

স্টেট্ ফবেনসিক সায়েন্স ল্যাবর‍্যাটরি
বেলগাছিয়া
কলকাতা-৩৭

ডাঃ এস, চৌধুরী
ডিরেক্টর

বাবা ও মাকে



১

মহাভারতের শকুনি চরিত্র প্রতিহিংসার মূর্ত প্রতীক—এ গল্প আমরা জানি। যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে একজন কাউকে খুন করে সেই হিংসা চরিতার্থ করেন-নি। অবশ্য তিনি তার জন্যে কি করেছিলেন এবং সেটা কতখানি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল তা এখানে বলার দরকার নেই।

আসল কথা হচ্ছে এই, যে শুধু একটিমাত্র মানুষকে খুন করার জন্যে যে প্রবৃত্তি মনের ভেতর জাগে, তার মূল উৎসও যদি সেই 'শাশ্বত প্রতিহিংসা'-ই হয়, তাহলে সেটা যে কী ভীষণ দানবীয় চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়—তার প্রমাণ

মহাভারতেও যা দেখেছি, এ-ভারতেও ঠিক তাই। ব্যবধান শুধু কালের—পার্থক্য শুধু প্রয়োগ-কৌশলের।

'ক্রিমিনোলজি'—মানে, অপরাধ-বিজ্ঞান বলে, খুন করার পেছনে যে সব কারণ থাকে, তার মধ্যে একটি কারণই মারাত্মক—সেটি হচ্ছে —প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনা। তাই মহাভারতের 'অম্বা' নিজের দেহ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আবার জন্ম চেয়েছিল শুধু ভীষ্মকে শরবিদ্ধ করে হত্যা করার জন্যে—শিখণ্ডিরূপে। এখানেও সেই একই প্রতিহিংসার জ্বালা।—এই হিংসা আরও বীভৎস রূপ ধারণ করে যদি সেটা যৌনঘটিত হয়।

একদিন এমনি একটি বীভৎস হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হয়েছিল ফরেন্সিক সায়েন্স লেবোরেটারীর বিশেষজ্ঞকে। শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানাগারে 'একজিবিট' পরীক্ষা করেই নয়, নানা মনোবিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে সেই মাকড়সার জাল ছিঁড়ে খুনীকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

এবার সেই জীবন-নাট্যের পটভূমিকায় আসা যাক্।

ফুচনলাল মল্লিক ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ। অর্থের চেয়েও সে চাইত নিরুদ্বেগ বিশ্রাম। খাটাখাটুনি খুব বেশী করতে পারত না। তাই রোজগার ছিল কম। সেই কারণে তার স্ত্রী মধুবালাকে বাড়তি আয়ের জন্যে বাজারে শাকসব্জি ফলমূল বিক্রি করতে হত। ফুচনলাল ভোরে কাজে বেরিয়ে যায়—লোহালক্কড়ের দোকানে কুলির কাজ করে—সন্ধ্যের পর ফেরে। মধুবালা ফুটপাতে শাকসব্জির ঝাঁকা নিয়ে বসে। কিন্তু উপদ্রব লেগেই আছে। কর্পোরেশনের লোক ও পুলিশ দু'জনেই তাড়া করে। থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ গালমন্দ করে—। ফুটপাতে বসার নিয়ম নেই—জরিমানা দিতে হয় মাঝে মাঝে মধুবালাকে।

উপায় না দেখে মধুবালা কৌশল খাটাল। বাড়তি রোজগার না করলে সংসার চলে না। ফুচনলালের ওপর রাগ হয় মধুবালার।

কেন সে অন্য সব বস্তির কুলিদের মতো খাটে না—বেশী টাকা ঘরে আনে না। ফুচনলাল নিরুত্তর। অগত্যা মধুবালা কর্পোরেশনের একটি লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করল। সংসারের দুঃখের কথা, স্বামীর অসুখের কথা, আর তার নিজের কষ্টের গল্পও ইনিয়ে বিনিয়ে বলল। মধুবালা স্বাস্থ্যবতী—সুন্দরী। যে দুটো জিনিসের জন্যে ভয়ে সে রাস্তায় বেরুতে চাইত না—সেই দুটোকেই মধুবালা মূলধন করে ব্যবসা চালাতে লাগল—বাঁচার তাগিদে।

প্রচুর পয়সা রোজগার করতে লাগল মধুবালা। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব বিক্রি হয়ে যায় চড়া দামে। কেউ আপত্তি করে না। কেউ গালাগাল করতে আসে না। দিন কাটে, মাস কাটে। এদিকে কর্পোরেশনের লোক শঙ্করলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে মধুবালার। অনেক পয়সা রোজগার করে সে। আট আনার জিনিস মধুবালার কাছ থেকে একটাকা দিয়ে কেনে। ব্যবসা এইভাবে ভালোই চলছিল।

কিন্তু বস্তির প্রতিবেশীদের চোখে তা ভালো ঠেকল না। ঠেকার কথাও নয়। তারা গরীব—কুলিশ্রেণীর লোক। তবুও তাদের ঘরের জেনানা কি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বদমাশ আদমির সঙ্গে মিশে পয়সা আনতে? সংসারের ইজ্জত নেই—সরম্ নেই ফুচনলালের?

শুনল ফুচনলাল সব—বুঝল সে। বলল মধুবালাকে।—কিন্তু এ কি! মধুবালা তাকে বলল, আমার খাটনির পয়সা খাস্, শরম্ নেই তোর? তবুও সে মধুবালাকে বোঝাল—পয়সা বড় নয়, বড় ইজ্জত। মধুবালা তা মানতে চাইল না। অসহায় ফুচনলাল নিরুপায়। সে বুঝতে পারল তার সুখের সংসারে চোরাপথে পাপ ঢুকে পড়েছে।

প্রায়ই ঘরে আসে শঙ্করলাল—সেই কর্পোরেশনের লোকটা। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, বিবাদও হয়।

এর কিছুদিন পরেই ফুচনলাল নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিখোঁজ হয়ে গেল সে। কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে এ দুনিয়ায়। সবাই নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বিশেষ করে ফুচনলালের বস্তিতে কারো সময় নেই অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়ার। চল্‌তি পথে কারো কারো শুধু চোখে পড়ে মধুবালা রূপের ডালা সাজিয়ে সেই আগের মতোই বেরুচ্ছে। কারো কারো চোখে পড়ে মধুবালা ফিরছে অনেক রাতে। ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। তাতে কার কি। কি এল গেল। কিন্তু বিপদ এল —লোকেশরাম আসার পর থেকে।

সাতদিন কাজে না যাওয়ায় লোহালক্কড়ের কারখানার মালিকের নির্দেশমত লোকেশরাম এল ফুচনলালের বাড়িতে খোঁজ নিতে। কিন্তু মধুবালার এলোমেলো উত্তরে সন্তুষ্ট হল না লোকেশরাম। মধুবালা বলল, ফুচনলালের যক্ষ্মারোগ হয়েছে। সে যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।—কোন্ হাসপাতাল? তার কিন্তু সঠিক উত্তর মিলল না। কি আশ্চর্য—! মধুবালার কথাবার্তায় লোকেশরামের মনে সন্দেহ জাগল। তবে কি কোন ষড়যন্ত্র আছে ফুচনলালের হঠাৎ নিরুদ্দেশের পেছনে?

লোকেশরাম ভালবাসত ফুচনলালকে। তার সরল সহজ অমায়িক ব্যবহার—তার সংসারের দারিদ্র্যের গল্প এবং ঐ সঙ্গে তার স্ত্রী মধুবালার ফুটপাতে শাকসব্জী বিক্রির সলজ্জ সংবাদ দান, সবই লোকেশরামের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। সেই বন্ধুর অকস্মাৎ এই নিরুদ্দেশ, সহজ ভাবে নিল না সে। সোজা এসে হাজির হল থানায়। যতটা সে নিজে জানত, শুনেছিল ফুচনলালের কাছে, সবই বলল। এবং আরও একটা খবর সে পুলিশকে দিল—বস্তিতে সে একজন লোককে ঢুকতে দেখেছে যার ডান হাতটা কাপড় দিয়ে জড়ানো—মনে হয়, পুড়ে গেছে। পোড়াটা নতুন। লোকেশরাম দু'দিন বাদে আবার এসে পুলিশকে বলল—সেই লোকটা মধুবালার ঘরে বসে গল্প করছে।

পুলিশ যথারীতি অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু মধুবালার কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু লোকেশরামের এই সংবাদে পুলিশ সোজা গিয়ে গ্রেপ্তার করল সেই লোকটিকে। বস্তির সবাই লোকটিকে চেনে। নাম গোলকরাম। ফুচনলালের বন্ধু। গোপন অনুসন্ধানে পুলিশ জানল গোলকরামের হাতের ক্ষত হয়েছে ১৯শে আগস্ট অর্থাৎ দু' দিন আগে। ফুচনলাল কাজে অনুপস্থিত হয় ১৮ই আগস্ট থেকে, তাহলে…?

—১৮ই আগস্ট ফুচনলালকে দেখেছ? কখন দেখেছ?

চোখ বুজিয়ে স্মরণ করল একজন প্রতিবেশী, আঙুল গুণে বলল, —হ্যাঁ হুজুর দেখেছি। আমার ঘরে এসেছিল। বড় ছেলের 'বেমারি' ছিল। সদানন্দ ডাক্তারবাবু এসেছিল—ফুচনলাল ভি এল, দেখল—চলে গেল। তখন সকাল হোবে। বলল কি—কাজে যাবে না, কোথায় এক সাধুর কাছে যাবে। আর দেখিনি হুজুর। আমার নাম ভিখনলাল।

—সাধু!

—হাঁ হুজুর, বলল, ঐ সাধুর কাছেই যাবে। ছুটি লিয়েছে। ফুচন তো মিথ্যে বোলে না, হুজুর—

কথাটা মিথ্যে বলেনি ভিখনলাল। পুলিশ খবর নিল যে, পাড়ার ডাক্তার সদানন্দ চৌধুরী ১৮ই তারিখে সকালে বস্তিতে যায় রোগী দেখতে। ভিখনলাল নামে একটি লোকের ছেলের অসুখ ছিল।

—ফুচনলালকে চেনেন? ঐ বস্তিতেই থাকে?

—না। বস্তির লোক আমায় বড় একটা ডাকে না। আমার 'ফিস্' দশ টাকা।

—ও—হতাশ হলেন পুলিশ অফিসার। অপরাধীকে অনুসন্ধান করার কোন সূত্রই পাওয়া গেল না। গোলকরাম এক কেমিক্যাল লেবরেটারীতে বেয়ারার কাজ করে। অসাবধানতাবশত তার হাতে অ্যাসিড পড়ে যায়। সে বলে, হুজুর—গরীব কুলি আমরা—অত

নরম শরীর তো নয়। তাই হুজুর অত সব ডাক্তার-টাক্তার কোথা পাব। ফুচনলাল বন্ধু লোক—গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে, শুনলাম নেই। ওর বৌটা ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেছিল। তাই গেলাম হুজুর।

—কোন্ ডাক্তার?

—নাম জানি না হুজুর—ঐ পাড়াতেই থাকে—লম্বা লোক—পুরিয়া দিলেন, মলম ভি দিলেন—ব্যস্—ঐ থেকেই বাঁধা আছে। হুজুর মা-বাপ, এর সঙ্গে ফুচনলালের কি সম্বন্ধ আছে বুঝি না। ও তো চলে গেল বাড়ি ছেড়ে। কোথায়—কিছু জানি না হুজুর। ঝুটমুট আমায় থানায় আটকে রাখছেন—মারছেন হুজুর। আমি ফুচনলালকে চিনতাম— ওর বৌকে ভি চিনি—তাই আসি হুজুর।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল গোলকরাম। আদালতের নির্দেশমতই থানায় আটকানো হয়েছে গোলকরামকে। কিন্তু লাভ কি···?

তার হাত পোড়া আর ফুচনলালের নিরুদ্দেশ হওয়া হয়তো দুটো ভিন্ন ঘটনা। গোলকরামের বাড়ি তল্লাসি করেও কোন সন্দেহজনক জিনিস মেলেনি। শুধু মধুবালার একটা ছবি। আর এক বোতল দিশি মদ।

—কি অ্যাসিড -- ইন্সপেক্টার? কোন্ অ্যাসিডে হাত পুড়েছে গোলকের? নাইট্রিক অ্যাসিড কি না জেনেছেন?

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের প্রশ্নে চমকে ওঠেন ইন্সপেক্টার,—হ্যাঁ নিয়েছি স্যার, নাইট্রিকই বটে। সদানন্দ ডাক্তার খাতা দেখে বলেছে যে আঠারো তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত এই আটদিনের মধ্যে একটিই মাত্র পোড়া রোগী এসেছিল - নাম গোলকরাম, বাড়ি—লেন। সঙ্গে একজন মেয়েছেলে ছিল। সুন্দর দেখতে।

—কর্পোরেশানের সেই শঙ্করলাল লোকটা কিছু বলতে পারে না? ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইন্সপেক্টারের দিকে। অনেক কিছু জানতে চাইলেন তিনি।

ইন্সপেক্টার বললেন, —সে তো স্যার বাইরের লোক। তাই ওকে নাড়াচাড়া করিনি।

—সে কি ?—একটু দেখুন না। হয়তো ও খবর দিতে পারে। একটু থেমে বিশেষজ্ঞ আবার বললেন,—ফুচনলাল চলে যাওয়ার পর শঙ্কর-লালকে কেউ বস্তিতে যেতে দেখেছে কি না খোঁজ করুন।

ইন্সপেক্টার চলে যাচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞ হঠাৎ ডাকলেন,—একটা কথা অফিসার—ওয়ান মিনিট মোর।

—বলুন স্যার। বিশেষজ্ঞের ডাকে এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টার।

—শহরের সব ডাক্তারখানাগুলোতে খোঁজ নিন, নাইট্রিক অ্যাসিডের কোন রোগী এসেছিল কি না। হাসপাতালেও দেখতে পারেন।

পরের দিন ইন্সপেক্টার খবর নিয়ে এলেন, শঙ্করলালের শরীর আগুনে পুড়ে গেছে—জনতা ষ্টোভ জ্বালতে গিয়ে। তাই ছুটিতে আছে। জ্বর হয়েছে।

আরো সংবাদ সংগ্রহ করেছেন অফিসার। শহরের কোন একটি ডাক্তারখানায় একজন পোড়া রোগী এসেছিল, নাম মদনলাল কোয়েল। পোড়ার কারণ—নাইট্রিক অ্যাসিড। ওখানেও সঙ্গে মেয়েছেলে ছিল। সেও সুন্দরী। ডাক্তারের নাম শচীন মিত্র।

—নাম মিলল না। ডাক্তার রোগীর চেহারার কোন বর্ণনা দেননি ?

—হ্যাঁ। চেহারার বর্ণনায় শঙ্করলালকে বোঝায়, স্যার। কপাল কাটা।—ওকে অ্যারেষ্ট করার ব্যবস্থা করুন।

ইন্সপেক্টারের বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞ বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে নজরে রাখুন আর ঐ মধুবালাকেও—। আর সন্দেহ নেই—ফুচনলালকে এরাই হত্যা করেছে, খুব সম্ভব 'অ্যাসিড' দিয়েই—। কিন্তু হত্যা করতে 'অ্যাসিড' ব্যবহার করল কেন ? সে তো বড নিষ্ঠুর হত্যা—। আরো খোঁজ নিন বস্তিতে।

—ফুচনলালের বাড়িটা সার্চ করুন। 'নেবার'দের জিজ্ঞেস করুন। মনে হচ্ছে, ওরা ভয়ে বলছে না পাছে জড়িয়ে পড়ে। সেইটে বের করুন। খুনী সহজেই ধরা যাবে।

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের ভ্রূদুটো সামান্য কুঁচকে গেল। মৃদু হেসে বললেন,—স্যার, ঐ গোলকরামকে হাত করতে পারলে অনেক কাজ হয়। ও তো মুখ খুলছে না—। তবে মনে হয়, গোলকরাম অনেক কিছু জানে। হয়তো ফুচনলালের খুনের কথা ও বলতে পারে।

—একটা মতলব মনে এসেছে যদি কাজে লাগে, শুনুন বলছি—। টোপটা গেলে কি না দেখতে হবে।—

শুনে পুলিশ অফিসার হাসলেন। আর তার পরদিনই বিরাট কালো পুলিশভ্যান ও প্রচুর তকমা-আঁটা পুলিশ নিয়ে সকালে যথারীতি ফুচনলালের বাড়ি তল্লাসী করা হল। প্রতিবেশীদের একজন এবার বলল,—হুজুর, বল্‌তে ডর্ লাগে—ওরা গুণ্ডা হুজুর, যদি চাকু মেরে দেয়—

ইন্সপেক্টার ঘর তল্লাসী করে মধুবালা ও শঙ্করলালের একটা ছবি পেয়েছিল—মধুবালার মাথায় ঘোমটা। বললেন,—না কিছু হবে না। বল, আমরা রয়েছি।—ফুচনলালের বৌটা, হুজুর, বেইমান আছে—বহুৎ খারাপ—

—বেইমান! মধুবালা খারাপ বলছ—? কেন?

—হাঁ হুজুর—। ঐ শঙ্করলালের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে—বহুৎ খারাপ—। লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল প্রতিবেশী। প্রৌঢ় লোক—। ইন্সপেক্টারের তাগাদায় ও অভয়দানে সে যা বলল তা মারাত্মক—তদন্তের পক্ষে সেই সংবাদটুকুই অনেক। সে বলল, হুজুর, রোজই প্রায় ফুচনলাল ও মধুবালার ঝগড়া হত। একদিন ঐ শঙ্করলাল ভি ঘরেতে ছিল। ফুচনলাল বৌকে ঠেলে দিয়েছিল হুজুর রাগের মাথায়—! তখন ঐ শঙ্করলাল ফুচনকে মারল হুজুর—

বহুৎ মারল—। আমরা সবাই গিয়ে বাঁচাই হুজুর—। বৌটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—হাঁসছিল হুজুর—শয়তান—।

ইন্সপেক্টার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—ফুচনলালকে এরা কি খুন করেছে?

খুন! বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল প্রৌঢ় প্রতিবেশী।

—হ্যাঁ মনে হচ্ছে এরা খুন করেছে। বৌটা ভালো নয় বলছ—।

ইন্সপেক্টারের কথায় ভয় পেল প্রৌঢ়। বলল,—কি জানি হুজুর, লোক এরা ভালো নয়—।

কয়েকদিন পর গোলকরাম হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল—সে শঙ্করলালকে খুন করবে।

ইন্সপেক্টার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর টোপ কাজে লেগেছে। হিংসার জ্বালায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে গোলকরাম যেন পাগল হল। বলল—ঐ শঙ্করলাল খুন করেছে ফুচনকে। সে দেখাবেই সেই হত্যাকাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ। মধুবালা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে।

শহরের বাইরে সেই জঙ্গলের দেখা মিলল—যেখানে ঘটেছিল সেই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার খেলা। পুলিশের বড় কর্তা এলেন। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এলেন, পরীক্ষা করলেন সেই জায়গাটা। ঘাসগুলোও পরীক্ষা করলেন।

—ঘাসের রং দেখে বোঝা যাচ্ছে—জ্বলে গেছে—নাইট্রিক অ্যাসিড হবে। আরো এদিক ওদিক ঘুরলেন—। হঠাৎ একজায়গায় এসে থামলেন। বললেন,—মনে হচ্ছে, এখানে কারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে ঘাসগুলো। মানুষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এ জায়গাটা খোঁড়া দরকার—ওখানে বডিটা নেই তো? ভ্রূ কুঁচকে হঠাৎ গোলকরাম বিকৃত ভাবে হেসে বলল,—শালা ওখানেই বডিটা পুঁতেছে হুজুর।

আশ্চর্য! খুঁড়ে পাওয়া গেল, একটা মানুষের মুণ্ডু—শিরদাঁড়া—

পাঁজরা—পায়ের হাড়—হাতের হাড়—আরো টুকরো টুকরো অনেক অংশ। তবে এক জায়গায় নয়—বিভিন্ন স্থানে পোঁতা ছিল।

সযত্নে এই মানুষের কঙ্কালটা সংগ্রহ করা হয়েছিল, কারণ—লেবোরেটারীতে পরীক্ষা করে এ থেকে আসল মানুষটির দৈর্ঘ্য, তার চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা, মুখের গঠন, দাঁতের আকৃতি সবই বলা সম্ভব।

ফুচনলালের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের বর্ণনা বস্তিবাসীর অনেকেই নির্ভুল বলে আদালতকে জানায়। লোকেশরাম ফুচনের দাঁতে যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিল, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের মতামতের সঙ্গে তা অভিন্ন। (এক্ষেত্রে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে কোন অজ্ঞাতনামা একটি মানুষের মাথার খুলি (স্কাল্) পরীক্ষা করে ফরেন্সিক ডাইরেক্টর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার এস্. চৌধুরী মহাশয় একবার লোকটির মানসিক গঠন, তার শারীরিক পঙ্গুতা অর্থাৎ লোকটি কানা ছিল—তাঁর দাঁতের গঠন ইত্যাদি বলে দিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে ও আদালতে তাকে সেই অজ্ঞাতনামার খুনী বলে প্রমাণিত করে)।

এবার আবার গল্পের ছত্রটা তুলে নেওয়া যাক্—।

এক জায়গায় পাতা-ঘাস ঢাকা দেওয়া দুটো পাঁচ পাউণ্ডের বোতল পাওয়া গেল। ভেতরের সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ পরীক্ষা করেই বোঝা গেল—'অ্যাসিড'। নাকে এসে ঠেকল ওর সঙ্গে মদের গন্ধ। একটা ফুলকাটা রুমাল—যার কোণে নীল সুতো দিয়ে লেখা ইংরিজি 'এস' অক্ষর।

গোলকরাম অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল—বিপুল উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল—বলল,—এবার শালা মরবে—গলায় দড়ি পড়বে—বেশ হবে—কিন্তু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল—হুজুর, আমার গলায় ভি দড়ি লাগান হুজুর, আমায় ফাঁসি দিন—ফুচনলাল বড় ভালো হুজুর। ঐ শয়তানের পাল্লায় পড়ে....হায়....রে ভগ্‌বান—

অতর্কিতে শঙ্করলালের বাড়ি তল্লাসী হল। যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে :

(১) এক বোতল অ্যাসিড—

(২) এক বোতল দিশি মদ।

(৩) একটা গেরুয়া রঙের ধুতি—জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ।

(৪) একটা নকল পোড়া পোড়া সাদা দাড়ি।

(৫) অনেকগুলো সাদা রুমাল, প্রত্যেকটির কোণে নীল সুতো দিয়ে ইংরেজিতে 'এস্' লেখা—।

শঙ্করলাল গ্রেপ্তার হল।

থানায় অনেক লোকের মাঝখানে মদনলাল কোয়েল বলে ডাক্তার শচীন মিত্র যার দিকে আঙুল দেখালেন সে-ই শঙ্করলাল, কারণ ঐ ছদ্মনামেই শঙ্করলাল ডাক্তার মিত্রের রোগী হয়েছিল উনিশে। এর আগেই ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন পুলিশ অফিসার। অনুরোধ করেন থানায় আসার জন্যে—সনাক্ত করতে হবে একজনকে। বিস্মিত হন ডাক্তার,—কাকে ইন্সপেক্টার বাবু ?

—যাকে আপনি পোড়া রোগী হিসেবে পরীক্ষা করেছিলেন উনিশে তারিখে—

—ও—সেই অ্যাসিডে পোড়া, নাইট্রিক অ্যাসিডে। কি যেন নাম তার···। দাঁড়ান দেখে বলছি।—খাতা দেখে বললেন তিনি,—মদনলাল কোয়েল—উনিশে আগস্ট—হাত-পা-দেহ পুড়েছে—বার্ণিং ইনজুরী কেস—।

দ্বিতীয়বার শঙ্করলালের বাড়ি সার্চ করে চোরাই মাল পাওয়া গেল। পুলিশ বিছানার তলা থেকে পেল কোনও স্টুডিওতে তোলা মধুবালার ঘোমটা দেওয়া একটা ছবি—পাশে শঙ্করলাল। দু'দিন পরে মধুবালাকে আইনসঙ্গত ভাবে গ্রেপ্তার করে থানায় আনা হল।

ফরেন্সিক লেবোরেটারির রসায়নবিদের পরীক্ষার ফল জানানো হল। বোতল দুটোর মধ্যে একটা বোতলের ভেতরে নাইট্রিক

অ্যাসিড ও অ্যালকোহল। অপরটাতে শুধু নাইট্রিক অ্যাসিড—ঘাসগুলোতেও নাইট্রিক অ্যাসিড।—রুমালে—নাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল। যে বোতলটা ভর্তি অবস্থায় শঙ্করলালের বাড়িতে পাওয়া গেছে—তাতেও নাইট্রিক অ্যাসিড। খুবই আশ্চর্য। অ্যালকোহল ও স্ট্রং নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের সময়। গোলকরাম ও শঙ্করলালের দেহ পুড়েছে ঐ নাইট্রিক অ্যাসিডে। পোড়া নকল দাড়ি-চুলেও নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেল।

অ্যালকোহল মেশানো কেন অ্যাসিডে? এত উপায় থাকতে—এত সব মারাত্মক বিষ মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও, শঙ্করলাল নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করল কেন? এ প্রশ্ন সহজেই মানুষের মনে জাগবে। কেন সে অ্যাসিড ব্যবহার করল? তার কারণ—প্রতিহিংসা গ্রহণ। অন্য বিষ প্রয়োগ, হয়তো আরো অনেক সহজেই ফুচনকে হত্যা করতে পারত শঙ্করলাল—কিন্তু তা সে করেনি। সে চেয়েছিল দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারবে সে ফুচনকে। কারণ মধুবালার সামনে ফুচন শঙ্করলালকে সেই ঝগড়ার দিনে অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়েছিল। তাই সেই মুখের মধ্যেই শঙ্করলাল ঢেলে দিয়েছে স্ট্রং নাইট্রিক অ্যাসিড।

সাহায্য করেছে গোলকরাম। তারপর অপর বোতল খুলে মাথার ওপর উপুড় করে দেয় আবার। দ্বিতীয়বার আর চেপে ধরতে হয়নি গোলকরামকে। ফুচনলাল আগেই মরে গিয়েছিল। মাটিতে পড়ে যেতেই সর্বশক্তিতে ঐ শঙ্করলাল হঠাৎ শক্ত দু'হাতে গলা টিপে ধরে ফুচনলালের। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে গোলকরাম,—শালা শয়তান আছে হুজুর, দুশমন আছে—ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে ভীষণ চিৎকার করে ওঠে গোলকরাম। যেন সেই বীভৎস মৃত্যুটাকেই চোখের সামনে আর একবার দেখল গোলকরাম।

স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া ঝগড়া মিটে যাবে শুনে সতেরোই আগষ্ট

গোলকরামের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয় ফুচনলাল। এক সাধুর কাছে যেতে হবে আঠারো তারিখে। তাঁর দৈবশক্তিতে ও মাদুলি দানে সংসারে শান্তি ফিরবে। সহজ বিশ্বাসে গোলকরামের সেই মিথ্যে বানানো কথাগুলো মেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু গোলকরাম যে শঙ্করলালের সঙ্গে হীন ষড়যন্ত্র করছে এ বোঝার মতো বুদ্ধি ফুচনলালের নেই। সংসারে আবার শান্তি ফিরবে, এতেই সে খুশি। মধুবালাকে সে রাজি করাল। সহজেই মধুবালা সাধুর কাছে যাবার ব্যাপারে রাজি হল দেখে ফুচনলালের মন খুশিতে ভরে উঠল। বস্তির প্রায় সব বাসিন্দাকেই সে জানাল, তার সংসার থেকে এইবার 'দুশমনটা' সরে যাবে। তাই আঠারোই আগষ্ট সে কাজে গেল না। গেল সাধুর কাছে। তার আগে ভিখনলালের ছেলেটাকে দেখে গেল —বেমারী ছিল।

তারপর শুরু হল সেই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি। জঙ্গলের মাঝখানে একটা পোড়ো বাড়িব মধ্যে ওরা তিনজন। সাধু নাকি ঐ বাড়িতেই গভীর রাতে আসবে—আগুন জ্বালবে, হোম হবে, মন্ত্রপাঠ হবে। মড়ার মাথার খুলিতে ভরে মায়ের প্রসাদ আনবে—সবাই খাবে। তারপর আসল কাজ—সারারাত ধরে। শরীরে জোর চাই। তাই গোলকরাম মদ খাওয়াল ফুচনলালকে। গভীর রাতে এলেন সেই বহু-প্রতীক্ষিত সাধু। দোহারা চেহারা—গেরুয়া বসন—একমুখ দাড়ি—হাতে মড়ার খুলিতে পানীয়। সবটুকুই খেয়ে ফেলল ফুচনলাল, সারা শরীরটা জ্বলে গেল যেন। কি এটা—মদ? মধুবালাও খেল। মড়ার খুলিতে ঢেলে দিলেন সাধু। তারপর ওরা দু'জন। ভীষণ নেশা ধরল ফুচনলালের। সব চেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে তাকে। আর মেশান আছে মাদকদ্রব্য।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই ফুচনলালের মাথা টলতে লাগল। চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। শরীর অবসন্ন হয়ে গেল। ঝাপসা চোখে সাধুকে চিনেও ঠিক চিনতে পারল না ফুচনলাল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে

আসছে। হঠাৎ সাধু একটা বড় বোতল খুলে জোর করে ফুচনলালের গলার মধ্যে ঢেলে দিল—নাইট্রিক অ্যাসিড। তারপর সেই রোমহর্ষক মৃত্যুযজ্ঞ – সারারাত ধরে। আর এক বোতল নাইট্রিক এসিড মাথায় ঢালা হল। এটা ঢালল মধুবালা। কড়া রঙিন পানীয় খেয়ে মধুবালাও পাশবিক নরহত্যার উল্লাসে মেতে উঠেছিল।

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি—মারামারি হল। একজনের প্রাণ রক্ষার প্রবল চেষ্টা, অপরজনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা। তিনজনের কাছে ফুচনলাল শারীরিক শক্তিতে পেরে উঠবে কি করে। ঝাঁঝালো মদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় পা-দুটো কাঁপছিল—দৃষ্টি আরও ঝাপসা হয়ে গেল। ব্যস্,—গলে যাওয়া ফুচনলালের মৃতদেহটা তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ঘাসের মধ্যে পুঁতে দিল। তখন ভোর হচ্ছে।...আবছা অন্ধকারটুকু মাটিতে তখনও লেগে। উন্মত্ত নেশায় আরো কয়েক বোতল মদ খেল—ঐ সাধুবেশী শঙ্করলাল, ব্যভিচারিণী মধুবালা, আর ঐ গোলকরাম। তারপর ঘরে ফিরল।

১৯শে আগষ্ট ভোরবেলা মধুবালাকে টলতে টলতে একা বস্তিতে ঢুকতে দেখেছিল ভিখনলাল।

আদালত কক্ষ স্তব্ধ। কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান শঙ্করলাল—গোলক-রাম। অপর দিকে মধুবালা।

বীভৎস এক নরহত্যার তিন যন্ত্রী।

মানবরূপী তিন পিশাচ।

সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে থামলেন পাবলিক প্রসিকিউটর।

আদালত প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ গোলকরাম সব কথা বলল কেন পুলিশকে?—শঙ্করলাল ইয়ুজড দি ডায়াবোলিক্যাল মেথড্ অব মার্ডার উইথ নাইট্রিক অ্যাসিড্ অ্যাণ্ড গোলকরাম অ্যাসিস্টেড হিম—ইয়েট, হোয়াট হি ডিসক্লোজ্ড্? ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল? আপনার কি ধারণা?

—এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে গোলকরাম ছিল, এ কথা সত্যি। সে

নিজেই স্বীকার করেছে। তবু সে কেন বলল পুলিশকে সব ষড়যন্ত্রের কথা? তার কারণ,—মী লর্ড, এখানেও প্রতিহিংসার সেই মানসিক বৃত্তি কাজ করেছে। পুলিশ ইন্সপেক্টার হঠাৎ কৌশলে গোলকরামকে একটা ছবি দেখান—বলেন, শঙ্করলালের ঘরে পাওয়া গেছে। শঙ্করলাল মধুবালাকে সাদী করেছে—তারই ফটো।

একথা শুনেই গোলকরাম ক্ষেপে গেল।—মী লর্ড, হয়তো আপনি স্মরণ রেখেছেন ঐ রকম একটা ফটো গোলকরামের ঘরের মধ্যেও পাওয়া যায়। মধুবালা ওকেও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাই—মধুবালা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শুনে এবং মধুবালার ঘোমটা দেওয়া ফটো দেখে গোলকরাম পাগলের মত হয়ে যায়, সে প্রতিশোধ নিতে চায়। মী লর্ড, পুলিশ অনুসন্ধান করে জেনেছেন, গোলকরাম এর আগেও দু'বার জেল খেটেছে—একবার দু' বছর, একবার দশবছর।

...সাক্ষী দিল বস্তির অনেকে, এ ছাড়া ডাক্তার দু'জন। সাক্ষী দিল লোকেশরাম—। ফুচনলালের বন্ধু—কারখানার সহকর্মী।

পুলিশের দেওয়া ফটো সে ফুচনলালের ফটো বলেই চিনল। ডাক্তার দু'জন বাদে অন্যান্য সব সাক্ষীরাও মেনে নিল একে একে। ডাক্তাররা বললেন,—তাঁরা চেনেন না ফুচনলালকে। তাঁরা বললেন, শঙ্করলাল ও গোলকরামের শরীর নাইট্রিক অ্যাসিডেই পুড়ে গেছে। তাঁরা পরীক্ষা করেছেন এবং তার যথারীতি রেকর্ড রেখেছেন। শঙ্করলাল অবশ্য নাম ভাঁড়িয়েছে, তাহলেও সঙ্গের মধুবালাকে ডাক্তার চিনেছেন ঠিক। সেদিন সেও ছিল শঙ্করলালের সঙ্গে।

প্রৌঢ় পাবলিক প্রসিকিউটর মৃদু হেসে ধীরে ধীরে শেষ কথা বললেন,—মী লর্ড, কলেজে বছর ত্রিশেক আগে পড়েছিলুম, লেডী ম্যাকবেথের কাহিনী! আজ এই প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডিতে পা দিয়ে দেখলুম, সেই লেডী ম্যাকবেথকে—পোষাকটা আর ভাবটাই শুধু আলাদা। সেক্সপীয়র লেডী ম্যাক্‌বেথের শাস্তি দিয়েছেন নাটকে।

মী লর্ড, এ জীবনটাও নাটক, তাই সেখানেও সেই একই কাহিনী দেখছি। এখানেও শঙ্করলালকে খুনের নেশায় প্রেরণা যোগায় ঐ নারী—মধুবালা। মী লর্ড, শঙ্করলাল এ কথা বলেছে পুলিশকে। সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে, সে দোষী বলে আদালতকেও জানিয়েছে।....তাই বিচারে মধুবালাকেও খুনী বলে প্রমাণ করা হোক। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২-৩৪ ধারাতে শঙ্করলাল, মধুবালা ও গোলকরামকে অভিযুক্ত করা হল। শঙ্করলাল মদ বলে নাইট্রিক অ্যাসিড মেশানো মদ খাওয়াতে চেয়েছিল ফুচনকে। কিন্তু ফুচনলাল খায়নি। তাই বোতলশুদ্ধ ঢেলেছিল শঙ্করলাল ফুচনলালের মুখে, বলল—গোলকরাম।

নরপিশাচ শঙ্করলালের উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল, মধুবালার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আর গোলকরাম? আদালতের মধ্যেই মানস-চোখে সেই বীভৎস খুনের দৃশ্য দেখতে পেয়ে পাগল হয়ে গেল সে। এধার ওধার ছুটে পালাতে গেল। বাধা দিল পুলিশ। গোলক-রামের ভ্রূ কোঁচকানো সেই ভয়াবহ চাহনি, সেই আতঙ্কে শিউরে ওঠা শরীরের কাঁপুনি, সেই মরণার্তনাদ শুনে আদালত চমকে চমকে উঠছিল। এক সময় ঐ কাঠগড়াতেই গড়িয়ে পড়ল সে। আবার সেই চিৎকার, শেষ আর্তনাদ। ছুটে গিয়ে ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিলেন—'ডেড্'।

২

রেলওয়ে স্টেশন।

অজস্র যাত্রীর এলোমেলো চিৎকার ছড়িয়ে পড়েছে সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে—দিল্লী-কালকা মেল। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে চিন্তা-মগ্ন মন নিয়ে নামলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। নামলেন সঙ্গের সহকারী আরো কয়েকজন। গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ দু' একজন অফিসার ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে পার হয়ে এলেন দীর্ঘ পথটুকু। অত্যন্ত সংযত বাচনভঙ্গি, উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত। একজন ঝানু সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন,—স্যার, খুনের যে সূত্রটা পেয়েছেন, তাতে খুনীকে ধরতে পারবেন কি?



বিশেষজ্ঞ দৃঢ়-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়।

স্টেশনের বাইরে এসে অপেক্ষমান মোটরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ড্রাইভার গাড়ির দরজাটা খুলে ধরল। গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি। ধীরে ধীরে গাড়িটা ব্রিজের ওপর দিয়ে অগণিত যানবাহনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিল্লীর ধনী ব্যবসায়ী ওঁকারনাথ সিংকে রাত্রে তাঁর বিছানায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে আততায়ী ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। দিল্লীর পুলিশ হত্যার কোন কিনারা করতে পারেনি। কারণ হত্যাকারী পেছনে কোন চিহ্ন ফেলে রেখে যায়নি। অতি বিচক্ষণতা ও সাবধানতার পরিচয় দিয়েছে সে। অগত্যা দিল্লী থেকে ডাক পড়ল কলকাতার ফরেন্সিক সায়েন্স বিশেষজ্ঞের।

দিল্লী শহরের একটা বড় বাড়ির ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকতেন মিস্টার সিং। সঙ্গে ছোট ছেলে। মিস্টার সিং বয়সে প্রৌঢ়। ধনী ব্যবসায়ী বলে শহরে পরিচিত এবং 'সাচ্চা আদমি' বলে বিজ্ঞ মহলে খ্যাতি আছে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশ শক্ত-সামর্থ্য, লম্বা-চওড়া চেহারা। চোয়াল দৃঢ় এবং সবল। বড় বড় টানা টানা চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মৃত্যুর পর। চোখের পাতা ওপরে তোলা। সেই খোলা চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছিল হত্যাকারী ভয়ের চেয়ে অবাক হয়েছিল বেশী। খ্যাতনামা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের সন্ধানী চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল মৃত ওঁকারনাথের চোখের তারা দুটোর ওপর।

ছুরির আঘাত থাকলেও ওঁকারনাথকে খুনী খুন করেছে গলা টিপে।—ইট্ ইজ্ এ ডেথ্ বাই ষ্ট্রাংগুলেশন। জানালেন বিশেষজ্ঞ।

—কিন্তু স্যার, পাঁজরার ক্ষতটা দিয়ে রক্ত পড়েছিল অজস্র—।

—হ্যাঁ—'স্ট্যাব্-য়্যুণ্ড্' অর্থাৎ অস্ত্রের আঘাত তো দেখাই যাচ্ছে। তবুও লক্ষ্য কর, শ্বাসরোধে মৃত্যু। যদিও—

কথা শেষ না করেই থামলেন তিনি। স্থির দৃষ্টি তাঁর মৃতদেহের

ওপর। সারা দেহে রক্তের লাল ছাপ। লম্বাভাবে দেহটা পড়ে আছে খাটের একপাশে। সারা বিছানা এলোমেলো, চাদরের এক পাশটা তোষকের ওপর গুটিয়ে দলা পাকিয়ে রয়েছে। বালিশগুলো মেঝেতে পড়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ল অস্ত্র রাখার একটা চামড়ার খাপের ওপর।

—বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। কারণ কি বুঝতে পারছ?

—হ্যাঁ স্যার হত্যাকারী প্রথমে খুব সুবিধে করতে পারেনি। পরে ছোরা বা ছুরিকা চালায়। তাতেই ভদ্রলোক মারা যান।

—কিন্তু গলা টিপে মারার পর ছোরা চালানো হয়। খাপটার বড় সাইজ দেখে মনে হচ্ছে ছোরা। যদি অবশ্য এটা অস্ত্রটারই খাপ হয়। মৃতদেহ পোষ্ট্ মর্টেমে পাঠালেই বোঝা যাবে যে মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ কি না। যদিও গলার ওপর কোন হাতের ছাপ নেই, কারণ কি বল তো?

—হ্যাঁ, দস্তানা ছিল আততায়ীর হাতে। সসংকোচে উত্তর দিলাম।

—হ্যাঁ।

এরপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহ, রক্তাক্ত বিছানা ও অন্যান্য জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। এমন সময় নীচু হয়ে তাঁর নির্দেশমতো মৃতের ডান হাতের মুঠোটা খুলে দু'গাছা কালো চুল ফরসেপ্ দিয়ে সন্তর্পণে বের করে আনলুম। ক্রাইম বক্সের ভেতর থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে থরে থরে সাজানো ছোট ছোট আকারের অয়েল পেপারের একটা তুলে নিয়ে চুলগুলো সযত্নে মুড়ে রাখলুম।

সারা ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। ঝকঝকে ঘরদোর। দেওয়ালে ঝোলানো কয়েকটি ছবি। নানা দেশ বিদেশ ঘুরতেন মিস্টার সিং ব্যবসার খাতিরে, তারই সব ছবি। একপাশে একটি ছোট্ট দামি ফ্রেমে বাঁধানো দুটি ছেলের ছবি। নিশ্চয় মিস্টার সিং এর

ছেলে এরা'। বয়স ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে। সুঠাম স্বাস্থ্য, চুল পেছনে উল্‌টে আঁচড়ানো। গোঁফ দাড়ি কামানো।

ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করে কলকাতার লেবোরেটারিতে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হল তদন্তের ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারকে।

বড় ছোরার খাপ, বালিশগুলো, পায়ের পাতলা চাদর, সুজনী, তোষক, বিছানার চাদর ইত্যাদি সবই আলাদা আলাদা করে প্যাকিং হবে। ড্রয়ার খুলে এক বাণ্ডিল চিঠি, কয়েকখানা চেক বই আর একটা ডায়েরী পাওয়া গেল। ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো ছেলে দুটোর ফটোও 'সীজার-লিস্টে' লেখা হল। ফটোগ্রাফার বিভিন্ন কোণ থেকে মৃতদেহের ঘরে ঢোকার রাস্তা, পাশের দরজা, ইত্যাদির অজস্র ছবি নিলেন।

দু' একজন কৌতূহলী প্রতিবেশী সংবাদ দিলেন —মিষ্টার সিং-এর দুই ছেলে, বড় ছেলে অবশ্য সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন বছর-খানেক আগে। ছোট ছেলেটি সঙ্গে আছে, খুনের দিনই সকালে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। বাড়িটা তিনি চেনেন। ফোন নম্বরও জানা আছে। ফোন নম্বরটা খাতায় টুকে নিলুম।

অপর এক প্রতিবেশী জানালেন যে, একজন দাড়িওয়ালা লোককে তিনি রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরের পাঁচিল টপকে পালাতে দেখেছেন। লম্বা চেহারা তার। পালানোর গতিতে ছিল বিদ্যুৎ। পুলিশ অফিসারের অনুরোধে পাঁচিলটা পরীক্ষা করা হল— মাঝারি ধরনের উঁচু পাঁচিল। স্পষ্টই লক্ষ্য করা গেল পাঁচিলের গায়ে পায়ের আঙুলের ছাপ। বুঝতে পারা গেল হত্যাকারী খুব শক্তিশালী। লাফিয়ে উঠে হাতের জোরে সে তার দেহটাকে টেনে পাঁচিলের ওপর তুলেছে। পায়ের সামান্যই সাহায্য নিয়েছে।

বাঁ-পায়ের আঙুল ক'টার মধ্যে একটা আঙুল ছোট। আর সেটা—

সসম্ভ্রমে আলতো ভাবে বললাম,—হ্যাঁ, বুড়ো আঙুলটা হয় নেই, না হয় ছোট। কিন্তু পাঁচিলের ওপর অন্য কিছু থাকবে কি? হাতের ছাপ-টাপ…?

খানিকটা রক্ত পেলেও পেতে পারো, আঙুলের ছাপ থাকবে না। 'অন্ দি স্পট্-এনকোয়েরী' শেষ হতে চিন্তিতমনে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলুম। বিশেষজ্ঞ পুলিশ অফিসারটিকে বললেন, —ছোট ছেলেটিকে তার বাবার মৃত্যুর খবরটা জানান। আর পোষ্ট্-মর্টেমের রিপোর্টটা পেলেই কলকাতায় যোগাযোগ করবেন। 'ভিসারা'টা লেবোরেটারীতে পাঠাবেন। যদি শ্বাসরোধ করেই মারা হল, তাহলে আবার অস্ত্র ব্যবহার করা হল কেন? ওঁকারনাথের বড় ছেলে তো সন্ন্যাসী, ছোট ছেলে তার মামার বাড়িতে চলে গেছে। তা যদি সত্যি না হয় তাহলে সে কোথায়? সে-ই কি হত্যার জন্যে দায়ী? না কি ওঁকারনাথেরই কোন আত্মীয়? তাঁর প্রতিবেশীরাও তো হতে পারে! কোন দাড়িওয়ালা লোক হত্যা করেছে। সে কি খোঁড়া? বাঁ পায়ের একটা আঙুল নেই বলেই মনে হয়। কে সে? মনে এইরকম হাজারো প্রশ্ন নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পর যথারীতি অন্যান্য এক্‌জিবিটের সংগে কাঁচের 'জারে' মিস্টার ওঁকারনাথ শিং-এর ভিসারা—অর্থাৎ স্টম্যাক্, কিড্‌নি, লীভার, স্প্লীন ইন্‌টেস্টাইন্, হার্ট, লাঙ্‌স্ সবই পোষ্ট্-মর্টেমে পরীক্ষার পর কলকাতার লেবরেটারীতে পাঠানো হল। পুলিশ অফিসার মর্গের ডাক্তারের রিপোর্টটা আমার হাতে দিয়ে বললেন,—ডেথ্ বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন—শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়েছে। আর একটি মাত্র ক্ষত শরীরে। পাঁজরায়—।

একটু অবাক হলুম কথাটা শুনে।—তাহলে মৃত্যুটা ছোরার ঘায়ে নয়?

—এ-রিপোর্টে অবাক হবার কি আছে? মিস্টার শিংকে যে-লোক খুন করেছে, সে সহজে খুন করতে পারেনি। খুনীর ঘরে ঢোকাটা

হয়তো মিস্টার সিং বুঝতে পারেননি, তাহলে অনেক বেশী সাবধান হতেন আগে থেকেই, কিন্তু খুনীর সঙ্গে তিনি রীতিমত লড়াই করেছেন। প্রৌঢ় হলেও গায়ে অনেক জোর ছিল মিস্টার সিং-এর।

সমর্থন জানিয়ে বললাম,—হ্যাঁ, স্যার, ভীষণ ধস্তাধস্তি করেছেন। বিছানার চাদর গুটিয়ে গেছে, বালিশ বিছানা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। জামা ছেঁড়াছেঁড়ি, চুল ছেঁড়াছেঁড়ি হয়েছে।

—তাহলেই বোঝ, এ অবস্থায় যদি ছোরার আঘাতেই মেরে ফেলা হত, তাহলে মিস্টার সিং-এর শরীরে একটার বদলে দশটা আঘাতের চিহ্ন থাকত, মৃত্যু হয়েছে গলা টেপার জন্যে। খুনী তদন্তকে শুধুমাত্র বিভ্রান্ত করার জন্যে শেষে একটা ছোরা মারার চিহ্ন রেখে গেছে। তাই মনে হচ্ছে, সে বুদ্ধিমান। পায়ের ছাপটাও সে ইচ্ছে করেই এড়াবার চেষ্টা করেছে। বিশেষজ্ঞ থামলেন। পুলিশ অফিসার বিস্মিত হয়ে বললেন,—সে কি! তাহলে তো আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। আমি ছোট ছেলেকে অ্যারেস্ট করে ইতিমধ্যেই হাজতে পুরে রেখেছি, স্যার। সন্দেহজনক অবস্থায় রেল ষ্টেশনে ওকে অ্যারেষ্ট করেছি।

—সেকি! আপনি কি ওকে খুনী বলে ধরেছেন! অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

পুলিশ অফিসার মৃদু হেসে বললেন,—অনেকদিন এ লাইনে কাজ করছি, আমার হাত থেকে খুনী পালাবে, এ কেউ ভাবতেই পারে না, স্যার। আরো খবর আছে, শুনবেন? অফিসার আরো জানালেন,—মৃত ওঁকারনাথের বড় ছেলে প্রীতম সিং কলিকাতার কাছাকাছি এক আশ্রমে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সে। বাবার সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি। সামান্য ঝগড়াও হয়েছিল, তারপর থেকেই প্রীতম সিং সন্ন্যাসী। সে-ও প্রায় এক বছর হয়ে গেল।

ছোট ছেলেটি তার ষ্টেট্‌মেণ্টে বলেছে, বাবার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সে এতই হতভম্ব হয়ে পড়ে যে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে

মামার কাছেই যাচ্ছিল। মামা ভোরেই দিল্লী ছেড়ে আগ্রা রওনা হয়ে গেছেন ব্যবসা উপলক্ষ্যে। বুঝলুম, তার কথা পুলিশের বিশ্বাস হয়নি।

আমাদের নির্দেশমতো কলকাতার পুলিশ বিভাগের সহায়তায় অত্যন্ত গোপনে আবার জোর তদন্ত শুরু হল। মিস্টার সিং-এর আত্মীয়দের সন্ধান নেওয়া, তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর্বও পুরোদমে চলতে লাগল। সকলের চুল, রক্ত এমন কি পায়ের আঙুলের ছাপও নেওয়া হল এবং সেগুলো ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে যথাসময়েই পৌঁছতে লাগল। মৃতের হাতের মুঠোতে পাওয়া চুলের সঙ্গে কার চুল মেলে, তারই পরীক্ষা করা হবে লেবোরেটারীতে। দিল্লীর পুলিশ অফিসারের নিয়ে আসা অনেকগুলি এক্জিবিটের মধ্যে একটি কাগজের মোড়ক বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার মধ্যে ছিল একখানা ছেঁড়া নেকড়া। সাদা নেকড়াটার মধ্যে জায়গায় জায়গায় রক্ত। কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছে মনে হয়।

আশ্চর্য! মৃত ওঁকারনাথের বিছানায় নাকি পাওয়া গেছে এই নেকড়ার টুকরোটা, সযত্নে তুলে নিলুম।

নেকড়াটা যখন পরীক্ষা করছি বিশেষজ্ঞ আমার চিন্তাযুক্ত মন লক্ষ্য করে বললেন,—ওটার রক্ত কিন্তু আলাদা গ্রুপের হতে পারে, ওঁকারনাথের গ্রুপের রক্ত হয়তো নয়।

বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম,—কেন স্যার?

—কারণ ওটাতে হত্যাকারীর শরীরের রক্ত লেগে আছে নিশ্চয়। তা না হলে ওটা এই বিছানার মধ্যে পাওয়া যাবে কেন? তাই ওটার পরীক্ষার ফলাফলের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। ভয়ানক ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় মনে হয় ওঁকারনাথও খুনীর গলা টিপে ধরেছিলেন। তার ফলেই খুনীর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে যায়। সে তখন

এই বালিশের ওয়াড়ে মুখ মুছে ফেলে। তারপর ওয়াড়টা ছিঁড়ে নেয়। বালিশটা লক্ষ্য করলেই বুঝবে।

লক্ষ্য করলুম একটা বালিশের ওয়াড়ের বেশ খানিকটা ছেঁড়া। কিন্তু হত্যাকারী কে হতে পারে? মিস্টার সিং তো ভদ্র, অত্যন্ত অমায়িক এবং সাধু প্রকৃতির। তাঁর শত্রু থাকতে পারে বিশ্বাস হয় না। এমন গলা টিপে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা কার পক্ষে সম্ভব, বিশেষ করে যখন পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে ওঁকারনাথের আত্মীয়দের সন্দেহ করার মতো কিছু তাঁরা পাননি।

নিহত ওঁকারনাথের হাতের বজ্রমুঠিতে যে দু'গাছা চুল পাওয়া গিয়েছিল তার পরীক্ষা করলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। আবিষ্কার করলেন বিরাট এক তথ্য।

বিংশ শতাব্দীতে ফরেন্সিক সায়েন্সের উন্নতির সংগে সংগে মানুষের মংগলের জন্যে এই সায়েন্সকে কাজে লাগানোর কথা বৈজ্ঞানিকরা নানা দিক থেকে ভেবেছেন ও ভাবছেন। অপরাধ তদন্তে এই সায়েন্সকে প্রয়োগ করা হচ্ছে সার্থকভাবে। তাই আজ এই সায়েন্সও এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে যা সারা পৃথিবীতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে তাই অভিনন্দনের চিঠি এসে পৌঁছেছিল বাংলাদেশে।

ওঁকারনাথ সিং হত্যা পৃথিবীর ফরেন্সিক বৈজ্ঞানিক মহলে বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছিল। কি বিরাট চমক! আর সামান্য দু'গাছা চুলের মধ্যেই সে রহস্য লুকোনো ছিল। সে কথা বলার আগে চুলের বিষয়ে একটু আলোচনা করি।

কিউটিকিল, কোর্টেক্স ও ম্যাডালা—চুলের তিনটে অংশ! চুলের এই তিনটে অংশকে একটা পেনসিলের তিন অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাইরের গা-টা, যার ওপর নাম ইত্যাদি লেখা থাকে, এরপর

ভেতরের অংশ অর্থাৎ কাঠ এবং শেষে শিষ। পেনসিলের এই তিন ভাগের মতো চুলকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সোজা কথায়—পেনসিলের ওপরের রংটা কিউটিকিল, ভেতরের কাঠটা কোর্টেক্স আর আর শিষটা ম্যাডালা।

আসল যে অংশ, তা হচ্ছে—ম্যাডালা। তাই বলে কোর্টেক্স বা কিউটিকিলের মূল্য কম, তা বলছি না। এই হত্যাকাণ্ডে ম্যাডালার মূল্য ছিল বেশী। তাই সেটাই আলোচনা করব।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ চুলের মধ্যে এই ম্যাডালার অংশটুকু নিয়েই বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন। এর সাহায্যেই তিনি একটি মানুষকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে চান। অপরাধ তদন্তে এই গবেষণা তাই বিশেষ মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে—সারা পৃথিবীতে।

একটি চুলের মধ্যে একটি ম্যাডালা দেখা যায়। এটাই স্বাভাবিক। কোটি কোটি মানুষের চুল পরীক্ষা করেও পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিকের চোখে এর ব্যতিক্রম ধরা পড়েনি। কিন্তু সুবিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ আবিষ্কার করলেন একটি চুলের মধ্যে দুটি ম্যাডালা! পরিষ্কার নয়, তবুও দৃষ্টি এড়ায় না!

অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎচমক। মৃত ওঁকারনাথের হত্যাকারীকে সন্ধান এবং প্রমাণ করার একটা সহজ পথ খোলা রইল।

চুল পরীক্ষা করে যেমন জানা যায় চুলটি মানুষের—না, জন্তু জানোয়ারের তেমনি বোঝা যায় চুলটি শরীরের কোন্ অংশের। ওঁকারনাথের মুঠির চুল ছিল দাড়ির।

এই পরীক্ষাটুকু নিশ্চিত হওয়ার পর সহজে ধরা গেল, যে দিল্লীর প্রতিবেশী ভদ্রলোকের অনুমান ছিল নির্ভুল। আততায়ীর সত্যিই দাড়ি ছিল। কিন্তু কে সে?

নেকড়ার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে সে রক্ত নিহত ওঁকারনাথের নয় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

এইবার বিজ্ঞান আলোচনা সরিয়ে রেখে গল্পের গতিটা অনুসরণ করা যাক্।

গল্পের মূলকেন্দ্র একটি আশ্রম। আমাদের নির্দেশে ছদ্মবেশী পুলিশ হানা দিল সেই আশ্রমে। রূপকথার গল্পের জৌলুশ যেন এই গল্পের কাছেও ম্লান মনে হয়।

ইন্সপেক্টার যা বললেন,—আমি এখানে সেটুকু সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদের কাছে নিবেদন করছি :

কলকাতার কাছেই তন্ত্রসাধকের আশ্রম। ওঁকারনাথের বড় ছেলে প্রীতম সিং সেই আশ্রমেই সন্ন্যাস নিয়েছেন। স্থানটি শান্ত সুন্দর। প্রকৃতির মায়াজড়ানো এক ধর্মীয় পরিবেশ।

বিপুল আয়োজনে সন্ধ্যারতি চলছে। ভক্তসমাগমে জায়গাটি জমজমাট। টকটকে লাল চেলী গায়ে জড়িয়ে ভক্তের দল বসে আছেন। সত্যি গা-ছমছমে পরিবেশ।

জুতো খুলে একটা কোণে রেখে নিঃশব্দে ভিতরে এলুম।

একটা আসন দখল করে বসলুম। ঢাক বাজছে, কাঁসর বাজছে—আর বুক কাঁপানো স্বরে প্রধান পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন। সকলেরই তন্ময় ভাব। ধূপধুনোতে ঘর প্রায় ঢেকে গেছে। কাউকে ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁকে খুঁজে বের করতে বিশেষ দেরি করেনি। শান্ত সৌম্য দেবপ্রভাবিত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা অথচ শিশুসুলভ আত্মতৃপ্তির হাসি চোখে মুখে। সেই পুরোনো চেহারা যা ছবিতে দেখেছি। শুধু মাথার চুলগুলো বাবরি চুলের মতো দেখাচ্ছে। গোঁফ দাঁড়ি কামানো—টানা টানা চোখ। উঠে গিয়ে পাশে বসতেই একটু হেসে সামান্য একটু সরে গেলেন তিনি। নিঃশব্দ হাসিতে হাত তুলে নমস্কার করে বললাম,—বড় ভাল লাগছে জায়গাটা। একটু বাইরে আসবেন একটা কথা বলব, বড্ড জরুরী।—

আমার দিকে স্থির ভাবে চেয়ে বড়দা বেরিয়ে এলেন। ভূমিকা না করেই বললুম,—ওঁকারনাথ সিং মারা গেছেন।

অবিচল ভঙ্গিতে বড়দা শুধুমাত্র আকাশের দিকে চাইলেন। এখন সন্ন্যাসী তিনি। কোন ব্যাপারেই বিচলিত হওয়া আর সাজে না। তাই শান্ত কণ্ঠে বললেন,—ছোট বড় কাঁদবে···। কিন্তু মৃত্যু—সেও সুন্দর। তারও প্রয়োজন আছে সংসারে। একথা ওকে বোঝাতে হবে। যদি একান্তই দরকার হয় আমাকেও যেতে হতে পারে—ও বড় ছেলেমানুষ।

বড়দা চলে গেলেন। আমিও ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখতে লাগলাম। এ ঘর ও ঘর সবই খোলা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসবাবপত্র-বর্জিত। সন্ন্যাসী এঁরা সবাই। তাই ভোগে এঁদের প্রয়োজন কি? অন্যমনা ভাবে একটা ঘরে ঢুকলুম। ঠাকুর দেবতার ছবি। তন্ত্রসাধকদেরই ছবি। আর আশ্রমের ভক্তবৃন্দের গ্রুপ-ফটো। বিরাট কোন উৎসবে হয়তো সকলের ছবি তোলা হয়েছে। ঐ তো প্রধান পুরোহিত। তার চারজন শিষ্য। আর···

কিন্তু এ কি! ঐটে কার ছবি! পেছনে দূরে বসে? এটা কবেকার তোলা? তারিখ?

এদিক ওদিক চেয়ে পকেট থেকে ছোট্ট দামি ক্যামেরাটা বের করে ছবির ছবি তুলে নিতে পাঁচ সেকেণ্ড লাগল।

দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। না, কেউ দেখেননি। সবাই পুজোর ঘরে। এত বড় ফ্রেমের ছবি নিয়ে যাওয়া তো কষ্টসাধ্য—তার চেয়ে এই ভাল।

বড়দা ধ্যানগম্ভীর। পাশে বসতেই মৃদু হাসলেন। আরো কিছুক্ষণ পরে পুজো শেষ হল। প্রসাদ পেলুম। বড়দার অমায়িক ব্যবহার। কোন চাঞ্চল্য নেই—জিজ্ঞাসাবাদ নেই—নির্বিকার মানুষ। সর্বত্যাগী পুরুষ।

ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে জোর গবেষণা চলছে। রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে। চুল পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু নাঃ । কাউকে সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই। বায়োলজি বিভাগের পরীক্ষাই গুরুত্বপূর্ণ। এ হত্যার খুনীকে ধরতে গেলে চাই তার রক্ত চুল, না হয় হাত পায়ের ছাপ। অথচ কোনটাই সংগ্রহ করা সহজ নয়।

—আচ্ছা বিজনবাবু, গ্রুপ ফটো থেকে ঐ পেছনের লোকটাকে বের করা যায়? আলাদা ছবি করে নেওয়ার সুবিধে আছে?

প্রশ্ন করলেন বিশেষজ্ঞ।

—দাড়িওয়ালা লোকটিকে? হ্যাঁ স্যার, দিন—ছবি তুলে দিচ্ছি। বিজনবাবু ফটো নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিজনবাবুর নতুন করে তুলে দেওয়া ফটোটা তুলে ধরে বিশেষজ্ঞ আমাকে বললেন,—একে চিনতে পারো?

এক নজরে লক্ষ্য করে বললাম,—কোন সাধু মহারাজ হবেন—। কেন স্যার?

—ভাল করে দেখ—। তাড়া দিয়ে উঠতেই একদৃষ্টে ছবির দিকে চেয়ে বললাম,—কোথায় যেন দেখেছি - কোথায়—? কার সঙ্গে যেন মিল রয়েছে—। কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলুম,—স্যার এ তো—

—হ্যাঁ!

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু দাড়ি? দাড়ি কেন? ছেলেদের তো কারো দাড়ি নেই। মিষ্টার সিং-এর ঘরে পাওয়া দুই ভাইয়ের ফটোতে এই চেহারা দেখেছি—সেই চোখ নাক···শুধু দাড়ি নেই কারো—

বিশেষজ্ঞ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—কিন্তু এই ফটোতে ভদ্রলোকের দাড়ি রয়েছে। মনে রেখো হত্যাকারীরও দাড়ি ছিল, সে কথা দিল্লীর প্রতিবেশী ভদ্রলোক বলেছেন।

আমরাও ওঁকারনাথের হাতের মুঠোর চুল পরীক্ষা করে দাড়ির চুল বলে জেনেছি। সুতরাং এর চুল পরীক্ষা করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে বললাম,—আপনি কি স্যার এঁকেই খুনী বলে সন্দেহ করেন? পুলিশ তো বলেছেন, ওঁর বিরুদ্ধে কোন ব্ল্যাক্ রিপোর্ট নেই, ওঁকে সন্দেহ করা চলে না তাছাড়া উনি সন্ন্যাসী। এই খুনের সঙ্গে প্রীতম সিং-এর কোন যোগাযোগ নেই।

বিশেষজ্ঞ আমার কথার উত্তর না দিয়ে শান্ত ভাবে বললেন,

—ওঁকারনাথ সিং-এর হত্যাকারী নকল চুল ব্যবহার করেনি। চুল পরীক্ষা করে আমরা কি পেলুম—? দাড়ির চুলগুলো জোর করে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। তার জন্যে আমরা চুলের গায়ে রক্তও পেয়েছি। সে-রক্ত হত্যাকারীর রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলেছে অর্থাৎ নেকড়ার রক্ত আর ওই রক্ত এক গ্রুপেব। তাই ভাবছি—। এমনি সময়ে পুলিশ অফিসাব এলেন। বিশেষজ্ঞেব নির্দেশ শুনে তিনি যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।—এ তো স্যার, কঠিন কাজ—। তবুও চেষ্টা করে দেখছি। আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে পুলিশ অফিসার চলে গেলেন।

কাজটা সত্যিই কঠিন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রীতম সিং-এর চুল সংগ্রহ করে এক্‌জিবিট যেমন করে পাঠান হয় তেমনি করে, নম্বর দিয়ে লেবোরেটারীতে পাঠাবার কথা বলা হল তাঁকে। এতে অনেকখানি সাবধানতা চাই। কারণ সন্ন্যাসী তিনি। সুতরাং এ কাজে বিপদও আছে। বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাতে নেই।

তাছাড়া প্রীতন সিং সত্যিই যদি খুনী হন, তাহলে ভীষণভাবে সজাগ হবেন। তাই তার অজান্তেই চুলগুলো যোগাড় করতে হবে।

পাঠাতে হবে ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে।

আশ্চর্য। গোয়েন্দা বিভাগের অসাধ্য কিছুই নেই। সপ্তাহ-দুই

পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। চুল পাওয়া গেল। বক্‌সিশের ব্যবস্থা করে নাপিতের সাহায্যেই কাজটা করা হয়েছে। কাগজে মুড়ে ফেলে দেওয়ার নাম করে সে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সব মোড়ক ক'টা।

আরো অনেক কথা বলে গেলেন পুলিশ অফিসার। সব কথাই খুব রোমাঞ্চকর। মন্দিরের মধ্যে নানা ছদ্মবেশ ধরে নানা কৌশলে সারা দিন সারা রাত প্রীতম সিংহকে পাহারা দেওয়াই ছিল অফিসারের কাজ।

একটা মোড়কের চুল পরীক্ষা হচ্ছে লেবোরেটারীতে। কিন্তু হতাশার স্পষ্ট ছাপ দেখছি বিশেষজ্ঞের চোখে-মুখে! এমন কি প্রথম ও দ্বিতীয় মোড়ক থেকে যে দাড়ির চুলগুলো পাওয়া গেল তার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চুলের সন্ধান মিলল না। তাহলে কি অনুমান মিথ্যে?

কিন্তু কোথায় 'সেই চুল'? তবে কি ···। কিন্তু না—ফরেন্সিক সায়েন্স বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনুমান শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হল না। একটি মোড়কের সহস্র চুলের মধ্যে থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন সেই 'ডাব্‌ল্‌ ম্যাডালা' সম্বলিত বিস্ময়কর চুল। সাফল্যের আনন্দে ভরে উঠল মন। সার্থক হ'ল পরিশ্রম।

মোড়কের সব চুলগুলিই দাড়ির চুল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রীতম সিং-এর দাড়ির সব চুলই 'দুই-ম্যাডালা'-যুক্ত নয়।

ওঁকারনাথ সিং-এর হত্যাকাহিনী অপরাধ-তদন্তের ইতিহাসে এক চরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অতর্কিতে একদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আশ্রমের প্রধান শিষ্য, সর্বত্যাগী পুরুষ—দেবকান্তি সদা-হাস্যময় ধর্মপ্রচারক প্রীতম সিংকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচারে সে খুনী বলে প্রমাণিত হল। শাস্তি হল। প্রীতম সিং এর পায়ের একটা আঙুল

ছিল ছোট। তার রক্তের গ্রুপ, নেকড়া ও দাড়ির চুলের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলল। কিছুদিন পর পুলিশ অফিসারের এক প্রশ্নে উত্তরে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন,—

—যে-চিঠিগুলো আমরা মৃত ওঁকারনাথের ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে পেয়েছিলাম, তাতে অনেক তথ্য ছিল। বড় ছেলে ও বাপে রাগারাগি হয় ব্যবসা নিয়ে। ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে সে একখানা চিঠিতে লিখে জানায় সে সন্ন্যাসী হবে। ওঁকারনাথের ডায়েরী থেকে পাওয়া যায় যে প্রীতম সিং বাড়ি থেকে পালাবার সময় কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যায়। সে সব আজ ধরুন, বছর-খানেক আগেকার ব্যাপার।

এরপর প্রীতম সিং মাথা খাটিয়ে একটা মতলব বের করেছিল। এক বছর সে দাড়ি কামায়নি। আশ্রমে সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। অনেকেই দাড়ি রাখেন। কিন্তু যিনি দাড়ি রাখবেন হঠাৎ তিনি বিনা কারণে সেই দাড়িটা কামাবেন কেন? বিশেষ করে ওঁর বাবা ওঁকারনাথ সিং মারা যাবার পরের দিনই উনি নাকি দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছেন। সে সংবাদ পুলিশ অফিসারই আমাদের জানিয়েছেন।

এরপর আশ্রমের যে গ্রুপফটোটা পুলিশ আমাদের দিয়েছেন তাতে প্রীতম সিং-এর উপস্থিতি ছিল আর প্রীতম সিং-এর ছিল দাড়ি। সেই দেখেই আমার সন্দেহ হয়। কারণ হত্যাকারীর দাড়ি ছিল। ফটোর তারিখ হচ্ছে—ওঁকারনাথ মারা যাবার তিন দিন আগের। আশ্রমের কোন এক উৎসবে তোলা।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে দাড়ির ছদ্মবেশে বাবাকে খুন করে তার পরের দিনই প্রীতম দাড়ি কামিয়ে ফেলে। এর পিছনে ছিল দুটো বিরাট উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, পুলিশকে বিভ্রান্ত করা, দ্বিতীয়তঃ, রক্তের চিহ্ন লোপ করা। পুলিশ শুধু দাড়িওয়ালা লোকেরই খোঁজ করে বেড়াবে

এই ধরণের একটা ধারণা হয়তো খুনীর হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে খুনী আরো খানিকটা সাবধান হতে পারত।

প্রীতম সিং-এর ঘর তল্লাসী করে পুলিশ পেয়েছিল একটা চক্‌চকে ছোরা।—তার হাতলের ভেতর ইস্পাতের ব্লেডে প্রচুর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হাতের দস্তানাজুটোর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

চামড়ার খাপটা পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে ছোরাটা ঐ খাপেই থাকত।

নতুন পদ্ধতিতে খুনী আবিষ্কারে ওঁকারনাথ হত্যা কাহিনী সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকাতেও বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করল।

পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞকে তাঁর ধৈর্য্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে সম্মান জানালেন।

ফরেন্সিক সায়েন্সের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চলছে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে। এই আবিষ্কার তারই অগ্রগতির পথে এক বিরাট বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।



৩

ভাঙাচোরা নোংরা দালানটার ওপরেই মৃতদেহটা পড়ে আছে। দেহ থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে, সরু কোমরের নীচে থেকে বাকি অংশটা ধারালো অস্ত্রের টানে পেঁচিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। পাঁচ টুক্রো করা দেহ।

আচমকা মনে হয়, গাঢ় লাল রঙের একটা চাদর পেতে কেউ বুঝি বা শুইয়ে দিয়ে গেছে। চোখ দুটোর ঘন কালো তারায় কী ভীষণ ভয়ার্ত দৃষ্টি! রক্তমাখা হাত-পা, সামান্য সামান্য ফুলে গেছে। শুভ্র বুকের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট গভীর ক্ষত। অজস্র রক্তপাতে পেট, কোমর, পা, লালে লাল। সেই ক্ষতস্থানে জমাট রক্ত তাল পাকিয়ে আছে যেন। দুরন্ত পাশব প্রবৃত্তির অসংখ্য ছুরিকাঘাতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এসেছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অসহ্য যন্ত্রণায়

ছটফট করতে করতে এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে জীবনটা। সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহ, বীভৎস সুন্দর। মনে হচ্ছে, শ্বাসরোধে মৃত্যু। বলিষ্ঠ দুটো হাত চেপে বসে গিয়েছিল গলার ওপর। আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে···ব্যস। তারপর দানবীয় হত্যা-শেষে মৃতদেহ অপসারণের পালা। পাঁচ খণ্ড হল দেহ। বিরাট এক দৈত্য যেন হিংস্র আক্রোশে অপূর্ব লাবণ্যময়ী এক সুন্দরী রাজকন্যার ক্ষীণ দুর্বল দেহের উদ্ধত যৌবন দলে, পিষে, থেঁতলে সব রস নিঙড়ে বের করে নিয়ে তার নিজের শরীরের সবটুকু গরল ঢেলে দিয়ে একটা প্রতিহিংসা মিটিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে। দেহটা লুকিয়ে জঙ্গলে মাটি চাপা দেবার সময়টুকুও পায়নি। হত্যার চিহ্ন পেছনে ফেলে রেখেই মিশিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।

সামনেই ছোট্ট নদী। চারদিক নির্জন, মাইল-দুয়েকের মধ্যে মানুষ বাসের আস্তানা চোখে পড়ে না। বাঁদিকে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে গ্রামের শ্মশান। একটা চিতা নিবু-নিবু। অদূরেই বড় ঘরখানা। শ্মশান-যাত্রীরা ওই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করে। ঘরের সামনেই দালান। একধারে চারটে সিঁড়ি নেমে গেছে। অন্য দিকটায় রেলিং দেওয়া, সেই দিকেই ঘন জঙ্গল। বিরাট শালবন, গজ তিরিশেক দূরে একটা বিরাট গাছ। দালানের সামনের দিকটাতেও রেলিং দেওয়া। তবে বর্তমানে মরচে ধরে খসে খসে যাচ্ছে। দালানের ওপর মৃতদেহ। কিন্তু একটা মোটা রক্তের দাগ সোজা ঘরের ভেতর থেকে দালানে এসে থেমেছে। ঘরের সারা দেওয়ালে অসংখ্য রক্তের ছোপ। মৃত্যু-ভয়ে চার দেওয়ালের ওপর ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়েছে মেয়েটি। কিংবা উন্মত্ত উল্লাসে মেয়েটির শুভ্র নিরাভরণ দেহটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে হত্যাকারী ঘরের এ ধার থেকে ও ধারে। ঘরের সাদা দেওয়ালের গায়ে দেহের বিভিন্ন অংশের ভাঙা ভাঙা ছাপ। ঘরের মধ্যে জলকাদা মাখা ফুটবল নিয়ে খেললে দেওয়ালের ওপর যেমন ফুটবলের ছাপ পড়ে তেমনি মেয়েটিকে নিয়ে

হত্যাকারী খেলা করেছে। মারাত্মক নৃশংস সে এক হত্যার খেলা।

ঘরের মধ্যে রক্তের ওপর অনেক মানুষের পায়ের ছাপ, জুতোর দাগ—দেওয়ালে আঙুলের কিছু চিহ্ন। আন্দাজ করা যেতে পারে, যার চিতাটা নিবু-নিবু হয়ে আসছে, তার শ্মশানবন্ধুরা শেষ কাজটুকু অসমাপ্ত রেখেই সরে গেছে। কারণ, এই নৃশংস হত্যার সাক্ষী হতে তারা চায়নি। ভোর হবার আগেই তারা সদলবলে হত্যার রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। হত্যাকারীর সাক্ষাৎ তারা পায়নি। হত্যার বীভৎসতা হয়তো তাদের আতঙ্কিত করেছিল। কোন পিশাচলব্ধ নারীবলি দিয়ে সেই রক্ত অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করে শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। গ্রামবাসীর মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে। এ হত্যা কোন কাপালিকের। তাঁরাও দেবতা। কথাটা মিথ্যে বলেনি অল্পশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলো—এ হত্যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্পেন দেশে ষাঁড়ের লড়াইয়ের সময় ক্লান্ত, অবসন্ন, মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর প্রতিপক্ষকে হঠাৎ বাগে পেয়ে দুর্দান্ত বলশালী ষাঁড় যেমন ভীষণ আক্রোশে বার বার তার লম্বা শিং দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে, তাজা লাল রক্ত দেখে ক্রমশ আরো ক্ষেপে ওঠে, আরো ভয়ঙ্কর রকমের নৃশংস হয়ে যায়, তেমনি হত্যাকারীও এই মেয়েটির শরীর ধারালো ছুরি দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে বোধহয় রক্ত দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল। মাংসলোলুপ নেকড়ের মতো কামড়ে নিয়েছে সে গালের মাংস, ঠোঁটের ওপরটুকু। মেয়েটির ডান ও বাম বুকের ওপর স্পষ্ট দাঁতের দাগ। নাকের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়ানোর চিহ্ন সজাগ সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কিন্তু দু'কানে দুটো মাকড়ি আর দু'হাতে চারগাছা করে সোনার বালা চুড়ি, একটা মোটা সোনার বিছে হার গলায় চিক্‌চিক্ করছে। এক অঙ্গে এত রূপ, এত মূল্যবান অলঙ্কার—মেয়েটিকে ধনী ঘরের বলেই প্রমাণিত করে। সারা জায়গায় কেমন একটা

ভয়াবহ নিস্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করছে। অদূরে একদল শবযাত্রী এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে এতই স্তম্ভিত হয়েছিল, যে তারা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো হরিধ্বনিটাও দিতে ভুলে গেল। নিঃশব্দে লেলিহান শিখা আকাশে উঠলো। সারা গ্রামবাসীই বুঝি বা শ্মশানে সমবেত হল খবর পেয়ে।

কিন্তু কেউ মেয়েটির পরিচিত নয়। অন্তত মেয়েটিকে সনাক্ত করার মতো কেউ শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিল না। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের প্রশ্নে এ ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল। কে এই মেয়েটি? এত জায়গা থাকতে এই দূরে নির্জন শ্মশানঘরের মধ্যে এসে মরল কেন? কেই-বা হত্যা করল তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে? নৃশংস কোন প্রতিহিংসা, না—যৌন প্রবৃত্তির বিকৃত অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে পশুর আচরণ প্রয়োগ করেছে। অবশ্য আততায়ী যে শুধু হিংস্র ছিল তা নয়, সে ছিল কামনাজর্জরিত, অসংযত, নারী-মাংস লোলুপ। তার অনেক চিহ্নই এখানে ওখানে ছড়ানো।

ফরেন্সিক লেবরেটারীর অভিজ্ঞরা নিজেদের কর্তব্যে সজাগ হলেন। শহরেই হোক আর গ্রামেই হোক খুনের পর সব যখন নিঝুম, নিস্তব্ধ, হতভম্ব কিংবা অপরাধী পুলিশের নজরের বাইরে আত্মগোপনে ব্যস্ত তখন ফরেন্সিক একমনে কাজ করে চলল।

অসংখ্য ফটো নেওয়া হল মেয়েটির। বিভিন্ন দিক থেকে তোলা হল ফটো। ঘরের মধ্যেই পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ—কোনটাই পরীক্ষাযোগ্য মনে হল না। বেশ কিছু কাঁচের টুকরো ঘরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে পাওয়া গেল। কিন্তু কোথায় গেল মেয়েটার শাড়ি, ব্লাউজ, জুতো? আততায়ী কি সঙ্গে নিয়ে গেছে?

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরতে লাগল নতুন কোন সূত্রের

সন্ধানে। ত্রিশ গজ দূরে একটা গাছের ওপর নানা ধরণের পাখি কিচ্‌মিচ্‌ করছে। দু'চারটে চিল ওপরের ডালে বসে আছে। গাছতলাটা বড্ড নোংরা। বিশেষজ্ঞ একাই ঘুরতে লাগলেন। হঠাৎ রেলিঙের ধার ঘেঁসে দালানের ওপর হাঁটতে হাঁটতে যে দিকটা জঙ্গল সেইদিকে থমকে দাঁড়ালেন। নীচে কাদার ওপর রক্তমাখা একটা পায়ের ছাপ। সন্তর্পণে ঝুঁকে পড়লেন বিশেষজ্ঞ। একটা নয়— দু'টো, দালানের ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়েছিল আততায়ী। জলকাদা-ভরা জায়গাটার ওপর। তারপর?

সামনেই ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা শালবন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন বিশেষজ্ঞ। কাছ থেকে দেখতে হবে ছাপগুলো। কিন্তু পুলিশের সতর্কবাণীতে থমকে দাঁড়ালেন বিশেষজ্ঞ।

—না না, যাবেন না স্যার। ভেতরে বিষাক্ত সাপ আছে। ভেতরে মানুষের হাঁটা পথ নেই। খুনী ওর মধ্যে দিয়ে পালাতে পারবে না। বন্য কুকুর, হায়না থাকাও বিচিত্র নয়।

—কিন্তু ঐ ছাপটা দরকার।

ফুট-প্রিণ্ট এক্সপার্ট প্রস্তুত হলেন। অগত্যা পুলিশের সাহায্যে ছাপ তোলার ব্যবস্থা হল। অনুরূপ পায়ের ছাপ গাছতলাতেও পাওয়া গেল। তারপর?

নদীর জলে নেমে পালিয়েছে খুনী। তার চিহ্ন দেখা গেল।

হঠাৎ একজন কনস্টেবলের আর্তনাদে সবাই চমকে উঠলেন। সচকিতে সকলে লক্ষ্য করলেন একটি চিল ঠোঁটে করে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে উড়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।···

উড়ে গেল। নিঃসন্দেহে মেয়েটির শাড়ি, সায়া, জুতো বাঁধা পুঁটলি। সর্বনাশ!—উপায়?

বড়কর্তার আদেশে মুহূর্তের মধ্যে কনস্টেবলের হাতের বন্দুক চিল লক্ষ্য করে গর্জে উঠল। চিৎকার করে বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে চিলটা

নদীর জলে পড়ে গেল। শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি সবই উদ্ধার করা হল।

খুনের পর এগুলো সরানো চাই, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আততায়ীর অসতর্ক মুহূর্তে চিলটা বোধ করি পুঁটলিটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে। তাই গাছতলায় আততায়ীর পায়ের ছাপ দেখা গেল। কিন্তু তার পাপের চিহ্নটুকু ফিরিয়ে পাবার আগেই কোন কারণে ভয়ে রেলিঙ টপকে শালবনে ঢুকে পড়তে হয়। পরে নদীর জলে নেমে রক্ত ধুয়ে নদীর জল পার হয়ে সে পালায়।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের নির্দেশমত যাবতীয় কাজ শেষ হল। ফুট-প্রিন্টগুলো নেওয়া হল। শিশিতে ভরে নেওয়া হল রক্ত। জামা, কাপড় ইত্যাদি সবই পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হল ফরেন্সিক লেবরেটারীতে পৃথক পৃথক এক্‌জিবিট হিসেবে। তারপর মৃতদেহ পোস্ট্-মর্টেমের জন্যে নিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার। ঘরটার মধ্যে আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল না। ছড়িয়ে থাকা বড় বড় চুলগুলি আগেই নেওয়া হয়েছিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে।

সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের স্থান পিছনে ফেলে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের জীপ উল্কা-বেগে ছুটে চলল শহর অভিমুখে। পাশে পুলিশের বড়কর্তা বসে আছেন। নির্বাক। নানা চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে আছেন বিশেষজ্ঞ।

এ-হত্যাকাণ্ডের পিছনে কি আছে? হত্যাকারী তো অলঙ্কার অপহরণ করেনি। এ কি তাহলে শুধুমাত্র যুবতী রমণীর প্রতি কুৎসিত লালসা? না—প্রতিহিংসা-জনিত হত্যা? কে সেই হত্যাকারী? শক্তিসামর্থ্যের দিক দিয়ে হত্যাকারী যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। আর যা-ই হোক, হত্যাকারী কিন্তু হত্যার ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়। বিশেষ কোন উত্তেজনার বশে সে হত্যা করেছে।

বাইরের চেতন মনটাকে সে কোন উত্তেজক দ্রব্যে অবসন্ন করে অবচেতন মনের কুৎসিৎ হিংসাকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু তার কোন রকম সাক্ষ্য 'পি-ও'তে অর্থাৎ 'প্লেস্ অব অকারেন্সে' পাওয়া গেল না কেন? হত্যাকারী যদি সতর্ক হত তাহলে ঘরের মধ্যে এত সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখে হত্যায় লিপ্ত হত কি? এত রক্ত, এত ছাপ—এসব রাখত না মোটেই।

সমস্ত ঘটনাটাকে চুল চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে করতে বিশেষজ্ঞ মূল সূত্রটাতে এসে পড়লেন।

হত্যাকাণ্ডের স্থানটা দু'জনেরই জানা ছিল। এটা যে শহরের বাইরে, লোকজনের যাতায়াত নিতান্তই কম একথাটা হত্যাকারীর অজানা নয়। গ্রামের অপর দিকে কাছেই তার একটা শ্মশান আছে। তাই এদিকটায় এত দূরে বড় একটা কেউ শবদাহ করতে আসে না। হত্যাকারী কাছাকাছি কোথাও না কোথাও থাকে। কিংবা এতদিন এখানেই এ গ্রামে ছিল।

যুবতী অপূর্ব সুন্দরী। তার দেহ-সুষমায় লালসাকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তার নিরাভরণ রূপ দেখে মনে হয় এ হত্যা যৌনঘটিত—'সেক্স-ক্রাইম'। তার চিহ্নস্বরূপ নানা ক্ষত সারা দেহে বর্তমান। তবে পোস্ট্-মর্টেমে বোঝা যাবে শরীরের ভেতরে সে ধরণের কোন আঘাত আছে কি না। বুকের, তলপেটের ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত গড়িয়ে এসে মাটিতে পড়েছে, তার পরিমাণ অল্প নয়।

মেয়েটি ধনী, বিবাহিতা, যদিও সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না, শুধু চুলগুলোর মধ্যে ছিল জমাট বাঁধা রক্ত, তারই দাগ সিঁথিটাকে লাল করে রেখেছিল। তবুও দেহের আকৃতি দেখে বোঝা খুবই সহজ ও যুক্তিযুক্ত যে মেয়েটি 'ভারজিন' নয়—। সুন্দর করে সাজানো চুলে এসেন্সের গন্ধ আছে—এ ছাড়া গয়না দেখেও মনে হয় মেয়েটি গরীব নয়, অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে।

তবে কি মেয়েটি ভ্রষ্টা? কোন এক পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার

লীলায় মত্ত ছিল? তারপর তার এই পরিণতি? কিন্তু হত্যাকারী বড়লোক হবার জন্যে তো এ খুন করেনি!

একটা প্রশ্ন মনে আসে, এ হত্যা কি পূর্বাহ্নে পরিকল্পিত? অর্থাৎ হত্যাকারী কি হত্যা করবে বলেই মেয়েটিকে এখানে ভুলিয়ে এনেছিল? না কি হঠাৎ সংযম হারিয়ে হত্যা করে বসেছে? তাহলে কি কোন চুক্তির ব্যাপার ছিল এই গোপন যোগাযোগের? তারপর মেয়েটির আপত্তির পরিণতি এই হত্যা? ক্ষতগুলোর আকার দেখে মনে হয়, একটা মাঝারি ধরণের ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে হত্যার সময়—কিন্তু কেন? বড় রকমের কোন অস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হল না কেন? তাহলে কি এ হত্যা আকস্মিক? আঘাত পেয়ে মেয়েটি কি কোন বাধা দেয়নি? নাকের ওপর আঁচড়টা কি প্রমাণ করে? মনে হয় অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যাকারী সহজে মেয়েটিকে হত্যা করতে পারেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যা করাও তার উদ্দেশ্য হয়তো ছিল না। সে বোধহয় চেয়েছিল মেয়েটি যাতনায় ছটফট করে বেঁচে থাকুক। তাই ছুরির আঘাতটা এলোমেলো। হয়তো মেয়েটি প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে লোকটা সত্যিই তাকে খুন করে ফেলবে। হাতের ওপর, কাঁধে, কপালে, এমন কি গালের ওপরের ক্ষতগুলো ততটা গভীর মনে হয় না, যতটা গভীর ক্ষত দেখা গেল বুকের দু'পাশে, পেটে, তলপেটে, কোমরের তলার অংশে ও জানুদেশে।

বিশেষজ্ঞ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, মেয়েটি কি হত্যাকারীর পরিচিত? খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। পরে সহজেই সিদ্ধান্তে এলেন—হ্যাঁ, বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

মেয়েটি যে স্বেচ্ছায় নিজেকে নগ্ন করেছিল তার প্রমাণ ঐ সাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি। একজন অভিজ্ঞ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের এটা বুঝতে কখনই ভুল হতে পারে না। ওগুলো সবই নতুন। কোন রকম ছেঁড়া, বা এমন কি কোন ফুটোও কোথাও পাওয়া গেল না। শুধু সায়া ভর্তি ধূসর রঙের দাগ লেগে আছে। যা খালি চোখে ঠিক বোঝা

যায় না। আলট্রা ভায়োলেট রে-তে তার হদিশ মেলে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে তবেই ঐ দাগের স্বরূপ চেনা যায়।

হত্যাকারী কি নিজে আহত হয়নি? পোস্ট্-মর্টেম ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। শালবনের মধ্যেই লুকানো আছে অনেক প্রমাণ। আর সেই প্রমাণগুলো উদ্ধার করতেই হবে!

বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে জীপটা থেমে গেল। যেন সম্বিত ফিরে পেলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ।

সামনেই হোটেল।

পুলিশের বড়কর্তা সসম্মানে বিশেষজ্ঞকে দোতলায় নিয়ে এলেন। আলাদা ব্যবস্থা। খাবার আয়োজন সম্পূর্ণ।

হোটেলের মালিক সত্যসুন্দর তেওয়ারী অমায়িক লোক। তার পঁচিশ বছর বয়সের সহকারী বিষণদাস ঠাকুর। কাজে-কর্মে পটু। তবে কানে কালা। লাজুক প্রকৃতির। ওটা বিনয়ের লক্ষণ হতে পারে।

সত্যসুন্দর তেওয়ারী খুবই প্রশংসা করলেন ছেলেটির।—কাজ-কাম ভালোই করে, লেকিন বহুৎ কিতাব পড়ে। তাতে অবশ্য কাজের ক্ষতি হয় না। যেদিন হবে সেদিনই তাড়িয়ে দেবে। এই তেওয়ারী সোজা কথার মানুষ। পয়সা দেব—কাজ নেব। না পেলে—ডিস্‌মিস্। আজকাল লোকের অভাব কি বাবুসাব—টাকা দিলেই মিলে যাবে—। ছেলেটি একবছর কাজ করছে, কিন্তু কোন খুঁত পাননি। তেওয়ারীর অনাবশ্যক এই প্রসঙ্গে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বেশ কৌতূহল বোধ করেন। আহার পর্ব সমাধা হয়। বিষণদাসই পরিবেশন করল। এছাড়া পুলিশ অফিসারের ছোটখাটো দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিল। অত্যন্ত নম্র, ভদ্র। গলার স্বর বড্ড ক্ষীণ। পাশে থেকেও শোনা যায় না। একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে হল —চাকরি আর কিচ্ছু জুটল না নাকি?

—আজ্ঞে—না তো। কান খাড়া করে কথাটা শুনে বলল বিষণদাস।

আবার চেঁচালেন অফিসার,—ভালো করে চেষ্টা কর—মিলতে তো পারে।

বিষণদাস হাসল—তেওয়ারীজী লোক ভালো। রামজির পূজো করেন।

—তুমিও পূজো কর।—পারবে না? বই পড়, পূজো করতে পারবে না?

এবার তেওয়ারীজী খিল খিল করে হাসেন।—বলেন,– হুজুর, ও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ব্যাটা কালা হয়ে মরেছে—।

ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে কেমন যেন ভয়ার্ত দৃষ্টি। বিশেষজ্ঞ একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ছেলেটির দিকে। তার কথা বলার ভঙ্গি, তার অহেতুক ভয়, তার অত্যধিক বিনয়ী ভাব সবই যেন কেমন অস্বাভাবিক, ছেলেটি হয় অসম্ভব বোকা, না হয় অতিরিক্ত চালাক।

কিন্তু কে এ? এই কি ছেলেটির প্রকৃত রূপ? না, সাধারণের চোখকে ফাঁকি দিচ্ছে বিষণদাস? এ কি হিন্দুস্থানী, না বাঙালী? বাংলা মেশানো ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলছে বটে তবে হিন্দি কি ওর মাতৃভাষা?

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানী চোখ স্থির দৃষ্টিতে থমকে রইল বিষণদাস ঠাকুরের চোখদুটোর ওপর। অদূরে নির্বাক হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন তেওয়ারী। হঠাৎ বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন হল,—কী কী বই পড়ে বিষণদাস, জানেন তেওয়ারীজী?

—সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ—। ধর্মগ্রন্থ—। কাব্য, পোয়েট্রি হুজুর।

—বই-টই পায় কোথায়? আপনি কিনে দিয়েছেন?

—ন্‌-না। পাশেই লাইব্রেরী আছে—। এ ছোকরা ওর মেম্বার

হয়েছে। বাবুজি, ও তো কুথাও যায় না—এখানেই থাকে। ওর কেউ নেই। অনাথ। তেওয়ারীর কথায় বাঙালীর টান আছে বেশি। মাঝে মাঝে হিন্দি কথা বেরিয়ে যায়।

—কি করে বুঝলেন ও অনাথ? কেউ নেই ওর?

অকারণ অনেকক্ষণ হাসলেন তেওয়ারীজী। তারপর মাথা নেড়ে বললেন,—আজ একবছর এসেছে হুজুর এই হোটেলে। না এসেছে কেউ দেখা করতে, না কোন চিঠিপত্তর। ছোকরাকে চড় মেরে ওর চাচা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল—। কান ভি খারাপ করে দিল। বেচারী বেমারিতে ভি ভুগল। ওর কোন রিলেটিভ নাই।

—ও—। তারপর—?

—হ্যাঁ—তাই বেচারী এসে চাকরি চাইল। চাকরি দিলাম। কিতাব পড়ে—তা পড়ুক। ভালো লেড়কা বাবুজি।—কাম কা আদমি, বহুৎ গরীব।—এই বিষণ—

বিষণদাস তেওয়ারীর ইঙ্গিতমত বিশেষজ্ঞ ও অফিসারকে প্রণাম করল। বাধা দিয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ উঠে পড়লেন। হাত মুখ ধুয়ে রুমাল বের করে মুছলেন। তারপর কী চিন্তা করে ব্যাগ থেকে দশটাকার নোট বের করে বিষণদাসের হাতে দিলেন। বকশিস। কিন্তু ছেলেটি নিতে নারাজ। বিশেষ করে মনিবের সামনে বিশেষজ্ঞের অনুরোধেও ছেলেটি ইতঃস্তত করতে লাগল।

—লাইব্রেরীতে বেশি করে চাঁদা দিয়ে বেশি বই আনবে। তেওয়ারীর অভয়দানের ভঙ্গিতে পুলিশ অফিসার হাসতে লাগলেন। ছেলেটি সসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তেওয়ারীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা-বাপ অন্নদাতা—।

দ্রুতপদে নেমে এসে জীপগাড়িতে বসলেন বিশেষজ্ঞ। তার সামান্য কিছুক্ষণ পরে পুলিশ অফিসারও নেমে এলেন। জীপ চলল। হঠাৎ অফিসার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বললেন,—স্যার—এর দরকার হবে না—এটা রেখে দিন—।

তারপর অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে তিনি যা বললেন তা শুনে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন। সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, —সে কি!—ইজ্ ইট্ ট্রু?

—ইয়েস্ স্যার—আমরা নজরে রাখি।—মাঝে মাঝে থানা ইন্-চার্জ আসেন। ছদ্মবেশে থাকেন, এটা ধরতে পারবে না।

সোজা রাস্তায় জীপখানা ছুটছে—গতি তার দ্রুত।

বীভৎস হত্যার সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হল। ছদ্মবেশী অজস্র পুলিশ ছড়িয়ে পড়ল দূর দূর গ্রামে, শহরে, হাটে—বাজারে, রেঁস্তোরায়, হোটেলে, রেলওয়ে স্টেশনে। যেখানে যত কুখ্যাত জায়গা আছে, চোরাই কারবারের গুপ্ত আস্তানা আছে, বদ গুণ্ডা প্রভৃতি বসবাস করে এমন বস্তি আছে, এমন কি প্রকাশ্য বা গুপ্ত পতিতালয়েও ছদ্মবেশী পুলিশ ঢুকে পড়ল। কিছু সংবাদ, গোপন তথ্য যদি উদ্ধার করা যায়। এত তৎপরতা সত্ত্বেও কিন্তু কোন সুফল পাওয়া গেল না।

ঘটনাস্থলের পায়ের ছাপ পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সে ছাপগুলো পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রাখা কোন খুনী আসামীর পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলল না।

যথারীতি পোস্ট্-মর্টেমের রিপোর্ট লেবরেটারীতে পাঠান হল। ঐ সঙ্গে একটা প্যাকেট। রিপোর্টটি খুব মূল্যবান, তদন্তের একটা দিকের রহস্য তা থেকে উদ্‌ঘাটিত হল।

প্যাকেটে পাওয়া গেল—(১) দুটো গ্লাস শ্লাইড—রসের মতো জিনিস লাগানো। (২) একটা লম্বা গ্লাস টিউব। টিউবের মধ্যে একটা মাঝারি আকারের কাঠি। কাঠির মুখে বেশ খানিকটা তুলো জড়ানো। তুলোটা রসের মতো কিছু জিনিসে ভেজানো হয়েছে।

বায়োলজি সেকশনে ঐ তিনটে জিনিস নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হল। এর আগে সায়া থেকে 'গ্রে স্টেন্স্'-ওয়ালা জায়গাগুলো কেটে নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা রি-এজেন্টের সাহায্যে ধুয়ে শুকিয়ে

নেওয়া হয়েছে। পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি বিশিষ্ট জিনিসের পরীক্ষা করা হয়। আসলে এ জিনিসটা কি—এ সম্বন্ধে যদি কোন পাঠক উৎসাহী হন তো ভবিষ্যতে আলোচনার বাসনা থাকল। এখন এখানে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে সেই জিনিসটা গ্লাস শ্লাইডে, টিউবের মধ্যেকার তুলোতে, সায়ার কাটা কাটা টুকরোতে পাওয়া গেল। এবং তারা একই গ্রুপের। ঐ সঙ্গে রক্তের গ্রুপটাও সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হল।

পোস্ট্-মর্টেম রিপোর্টে একটি অত্যাশ্চর্য তথ্য জানা গেল। মৃতদেহের মুখের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে রক্ত ও মাংসের টুকরো পাওয়া গেছে। এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া গেল মেয়েটি নিদারুণ অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সে কোন একসময় হত্যাকারীর শরীরের কোন এক অংশ কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল। এ ছাড়া পোস্ট্-মর্টেম রিপোর্টে জানা গেল মেয়েটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। তার চিহ্ন গলার ওপরে লক্ষ্য করা গেছে। ছুরির আঘাত ছাড়াও আঙ্গুলের নখের দাগ আছে। গলার সেইসব জায়গার মাংস হত্যাকারীর নখের ভেতরে চলে গেছে বলে মনে হয়।

মেডিকো-লীগ্যাল রিপোর্টটা যত্নের সঙ্গে আবার পড়লেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তাই তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্যে ও ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে অফিসারকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

তেওয়ারীর হোটেল। দূরদেশী ট্রেনযাত্রীর ভিড়ই বেশী। তারা ছাড়া কিছু স্থানীয় লোকও আছে। বিরাট হলঘর গম্গম্ করছে। হোটেলের মালিক তেওয়ারী সহাস্যে তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন। বিষণদাস দ্রুতগতিতে পরিবেশন করে যাচ্ছে। মনে মনে খুশি হয়েছেন তেওয়ারী, আজ ভিড়টা বড্ড বেশী। বিষণদাসও সমানে

তাল দিয়ে যাচ্ছে ওর মাইনে কিছুটা বাড়ানো দরকার। এক সময় কাঁধ চাপড়ে তিনি বললেন, জোরসে চালাও বেটা—ইনাম মিল যায়গা—।

বিষণদাস অসহায়ের ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার কাজে মেতে গেল, দৃষ্টি তার সজাগ। হোটেলের খুঁটিনাটি কোন ব্যাপারই তার নজরের বাইরে যায় না। রাত এগারোটার মেল ট্রেনটাও চলে গেল। শুধু স্থানীয় বা হোটেলের যারা স্থায়ী বাসিন্দা তারা ছাড়া সবাই চলে গেছে। ভিড়ের চাপও কমে এসেছে। এদের সবাইকেই তেওয়ারী চেনেন। তাই সন্দেহ করার কিছু নেই। মনে মনে এখন তিনি নিশ্চিন্ত। দেশে যে কত দুষমন আছে, তার হিসেব নেই। তাই তেওয়ারীর সব দিকেই নজর রাখতে হয়।

স্থানীয় লোকেরা নিজেদের মধ্যে শ্মশানতলার মেয়ে-খুনের গল্প করে তাও গোপনে সতর্ক কান দিয়ে শুনতে হয়। যথাস্থানে খবরগুলো পাঠাতেও হয়, এ-ও তার কাজ। খাবার সাপ্লাই থেকে—গোপন খবর সাপ্লাই। এর জন্যে উপরি পয়সা আছে। রামজীর কৃপায় সবই করেন তেওয়ারীজী।

অদূরে বড় সড়ক দিয়ে শেষ বাসটা চলে গেল। রাত সাড়ে এগারটা হবে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তেওয়ারীজী। লক্ষ্য করেননি, এক কোণে মাথা নীচু করে খাচ্ছিল বিখ্যাত ব্যবসায়ী রতনলাল মুন্সি। অনেক টাকার মালিক। বিষণদাস পরিবেশন করছে, আর গোপনে কানে কানে কী সব আলোচনা করছে। রতনলালের ঘর ভাড়া করা আছে এই হোটেলে। মাঝে মাঝে এসে থাকে। কৌতূহলী হয়ে তেওয়ারীজী লক্ষ্য করলেন রতনলাল আজ অনেক বেশী গম্ভীর।

শেষ খদ্দেরটিকে আপ্যায়ন করে তাকে বিদেয় দিয়ে হাসিমুখে তেওয়ারী এসে দাঁড়ালেন রতনলালের টেবিলের পাশে। তেওয়ারীকে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে রতনলাল হঠাৎ পুরো মদের বোতলটা উল্টে

মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—শয়তানী চলবে না সত্যসুন্দর। পুলিশের কাছে খবর চালান দিচ্ছ?—সাবধান। শালা, কুকুরের বাচ্চা কোথাকার, আমার পেছনে ফরেন্সিক লাগিয়ে দিয়েছ? আমার হাজারিবাগের বাড়ি, ঘর, দোর, জানলা পুলিশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে সার্চ করল। আমার সঙ্গে বেইমানী কোরো না তেওয়ারী। তোমার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেব। আমি খবর পেয়েছি চোপরানন্দ মিসিরকে--

অত্যন্ত বেশী নেশা হয়েছে রতনলালের। কথাটা একটানা শেষ করতে পারল না। দম নিয়ে আবার বলল,—তুমি চেনো, সে খুন করেছে মীরাবাঈকে। আমি ছিলুম না, বম্বে গিয়েছিলুম। তোমাকে তো বলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু শালা পুলিশ জানল কি করে? আমার পেছনে ধাওয়া করেছে, ধরতে পারেনি,—আমায় ধরলে তোমার ফাঁসীকাঠ আমি ঝুলিয়ে রেখে যাব তেওয়ারী। আর ঐ শালা—ওকে গুলি করে মেরে দেব একদিন।

হোঁচট খেয়ে টলতে টলতে ওপরে চলে গেল রতনলাল। বিষণদাস ধরে নিয়ে গেল। তালা খুলে ঘরে ঢোকাল, তেওয়ারী শুনল ভীষণ চিৎকার করে রতনলাল বলছে—শালা ঐ বেইমানকে খুন করব, বেটা পুলিশের চর।

আশ্চর্য! একটাও কথা বলল না সত্যসুন্দর তেওয়ারী, কী এক দারুণ চিন্তায় সে বিভোর, ভ্রূ-দুটো বার বার কুঁচকে যেতে লাগল। মনের ভেতর উত্তাল তরঙ্গ। একবার শুধু মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল—কে বেইমান? উত্তেজনায় তার সারা শরীর থেকে যেন দাউ দাউ করে আগুন বেরুতে লাগল।

নিস্তব্ধ রাত, সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শুধু বিষণদাস সন্তর্পণে দোতলায় পা টিপে টিপে তেওয়ারীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একটা শিসের আওয়াজে দ্রুতপদে বাইরে এল, তারপর একটা ভিখিরী গোছের লোকের হাতে একটা চিঠি দিয়ে ভেতরে এসে

শুয়ে পড়ল। ঘুমোল না। কারণ পরের ঘটনাগুলোর ভেতর তো সে-ই একমাত্র সাক্ষী। আর সবাই ঘুমন্ত।

শেষরাতেই রতনলাল মুন্সী খুন হল। পৈশাচিক মৃত্যু। তার মৃতদেহ শ্মশানঘাটের সামনে ত্রিশ গজ দূরের সেই গাছটার গায়েই আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল। শ্বাসরোধে মেরে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেল। মৃতদেহ যথারীতি পরীক্ষার জন্যে চালান দিল। রবারের একটা মুখোসে রতনলালের মুখটা ঢাকা। অতিরিক্ত মদ্যপান করার জন্যে হত্যাকারী সহজেই গলা টিপে মেরে ফেলেছে। মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, চোখ দুটো ঠেলে বাইরে চলে এসেছে, জিভটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। সাধারণের চোখকে এড়াবার জন্যেই হত্যাকারী রবারের মুখোস পরিয়ে দিয়েছে, আর গাছের সঙ্গে বেঁধে এসেছে। যাতে গন্ধে গন্ধে বন্যপশু এসে দেহটা ছিঁড়ে খেতে পারে।

হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর। কোন চিহ্ন ফেলে যায়নি। তবুও কিন্তু বেলা দশটার সময় অতর্কিতে পুলিশের একটি সুসজ্জিত দঃ এসে গ্রেপ্তার করল বিষণদাস ঠাকুরকে। হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে গাড়িতে তুলল।

তেওয়ারীজী সহাস্যে বললেন,—সবই রামজীর খেল, বাবুজি—

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গোপনে একখানি চিঠি লিখল তেওয়ারী, পুরীর ঠিকানায়। অত্যন্ত জরুরী চিঠি—নিজেই ভোরে ডাকবাক্সে ফেলে এল।

পুরীর ভারতী ধর্মশালা। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে অনেক সাধু-সন্তেরও ভিড়। সকলেই জগন্নাথদেবের মন্দিরে আসেন—দেবদর্শন করেন। সারাদিন পায়ে হেঁটে ঘোরেন, সমুদ্রে স্নান করেন, স্তব-পাঠ করেন, আবার ধর্মশালায় ফিরে যান। এই মোটামুটি তাঁদের প্রতিদিনের কাজের তালিকা, এর ব্যতিক্রম নেই।

ধর্মশালার মালিক সকলকে চেনেন না। কারণ যাত্রীদের

অনেকেই দু'চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। তাই আলাপ পরিচয় গড়ে ওঠে না। কিন্তু মালিক লক্ষ্য করলেন, এক ভদ্রলোক অন্ততঃ পনের দিন তাঁর ধর্মশালায় রয়েছেন। অথচ চার পাঁচ দিনের বেশী থাকার কথা নয়। কৌতূহলী হয়ে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

— মহাশয় কোথা থেকে—?

—আজ্ঞে বৃন্দাবন থেকে—

— নাম—?

—মিত্রানন্দ ঠাকুর—

—সঙ্গে কেউ আছেন কি?

—হ্যাঁ—সাধুজি, আমি তার সহকারী।

—ও—চ্যালা—।

মিত্রানন্দ মনে মনে বিরক্ত হল। মুখে কিচ্ছু বলল না, শুধু গম্ভীরভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ধর্মশালার মালিক বললেন,

— মহাশয় কি এখানে দীর্ঘদিন থাকবেন বিবেচনা করেছেন? মিত্রানন্দ মৃদু হেসে বলল,

—যতদিন না প্রভু অন্যত্র নিয়ে যান, সব তাঁরই কৃপা।

—কোথায় আপনার প্রভু—?

—ঐ তো—

ঘরের কোণে একটা সতরঞ্চির ওপর সাধুজি বসে আছেন—হয়ত ধ্যানমগ্ন। চক্ষুদুটি মুদ্রিত, পরণে লাল চেলি, সুদর্শন পুরুষ। ধর্মশালার মালিক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সাধুজির দিকে। সাধুজির সামনে পেছনে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই উৎসুক নেত্রে সাধুজির নিশ্চল ধ্যানমগ্ন মূর্তিকে ঘিরে রয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কাগজ।

মিত্রানন্দ শান্তস্বরে বলল,—বাবা মৌনী। তাই ভক্তেরা কাগজে লিখে তাদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে যায়।

ধর্মশালার মালিকও কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

ভক্তরা যাবার সময় প্রচুর অর্থ-সামগ্রী দিয়ে যায়। অর্থ সবই পকেটে লুকিয়ে রাখে মিত্রানন্দ। শুধু কাগজগুলো আর ফলমূল-সামগ্রী সাধুজির কাছে রেখে দেয়।

একদিন রাত্রে মন্দিরের প্রসাদ খাওয়ানোর সময় চুপি চুপি সাধুজিকে বলল মিত্রানন্দ—প্রভু, পুলিশ পেছনে রয়েছে, হানা দিচ্ছে।

সাধুজি ভ্রূকুটি করে শুধু মৃদু হাসলেন। তারপর ভক্তদের লেখা কাগজগুলো দেখতে লাগলেন। ঘরে ধুনি জ্বলছে। সাধুজি তন্ময় হয়ে লেখাগুলো পড়ছেন। মিত্রানন্দ এদিক ওদিক চেয়ে চাপা স্বরে বলল— আরও সাবধান হতে হবে।

সাধুজি এবারও নিরুত্তর রইলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেখাগুলো পড়তে লাগলেন। তারপর মাথা নেড়ে কাগজগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনের মধ্যেই ফেলে দিলেন।

মিত্রানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। কতশত কাগজ একইভাবে ভস্ম হল।

সাধুজি চাপা গলায় বললেন,

—'সব ভাল' লিখে দিবি। হ্যাঁ, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তোর জন্যেই কিছু হল না। ভাবলুম যা—হল আলাদা। এবার থেকে সব চেপে যা।

মিত্রানন্দ ঘাড় নেড়ে বলল,

—হাঁ তাই ভাল। লোকে আস্তে আস্তে সরে যাবে।

—সেই ভাল। চারদিকে নজর রাখিস্—সাবধান।

মিত্রানন্দ ঘরের দরজা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ল। ধর্মশালার মালিককে বিশ্বাস কি?

পরের দিন ভোরে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে মিত্রানন্দ স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে আরও অনেকটা এসে পড়ল। জায়গাটা অচেনা।

স্নানের জন্যে এখানে কেউ সমুদ্রতীরে নামে না। তাই জায়গাটা নির্জন।

হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে একজন ভদ্রলোক মিত্রানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভদ্রলোক সিমেন্টের ছোট বেঞ্চিতে বসে বই পড়ছে। মিত্রানন্দ পাশে বসতেই ভদ্রলোকটি একটু সরে বসল। মিত্রানন্দ জিজ্ঞেস করল,—আপনি কি হাওয়া বদলের জন্যে এসেছেন?

—হ্যাঁ—।

ভদ্রলোক বই থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দিল।

মিত্রানন্দ মৃদু হেসে বলল,—কতদিন থাকবেন?

—ঠিক নেই। আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন?

ভদ্রলোক এবার বইটা মুড়ে রাখল।

মিত্রানন্দ মৃদু হেসে বলল—তীর্থে তীর্থে ঘোরাই আমার কাজ।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বলল,—তাহলে আপনি কি সাধুজি?

—না—সাধুজির সঙ্গে সঙ্গে থাকি, তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

—কে—সাধুজি—? কোন্ সাধুজির কথা বলছেন?

—আছেন একজন—এই পুরীধামে এসেছেন, বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

—তাঁকে কোনদিন দেখিনি তো!

—তিনি দেখা করেন না। কাগজে লিখে দিলে উত্তর দেন।

—কি লিখে দেন!

—প্রশ্নের উত্তর যদি কিছু জানতে চান সেই সব। অনেকেই জেনেছে।

—ও—। বোঝা গেল বিশেষ কোন আগ্রহ নেই ভদ্রলোকের; আর কোন কথা নেই। বেশ কিছুক্ষণ দু-জনেই সামনের দিকে চেয়ে রইল। সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তীরে এসে। ভয়ানক হাওয়া বইছে।

—এর আগে ছিলুম বৃন্দাবন।

যেন আপন মনেই বলল মিত্রানন্দ।

ভদ্রলোক বড়ই অন্যমনস্ক। হঠাৎ বলল,—কতদিন আগে?

এবার উত্তর দিতে গিয়ে মিত্রানন্দ ভেতর ভেতর চমকে উঠল। কি জানতে চান ভদ্রলোক? পুরীতে কতদিন থাকবে, একথা জিজ্ঞেস না করে, বৃন্দাবনে কতদিন ছিল জিজ্ঞেস করার মানে কি?

মিত্রানন্দ উঠে পড়ল। তাহলে এই কি সেই লোক? দলের লোক যার কথা চিঠিতে গোপনে জানিয়েছিল?

ভদ্রলোক আবার বই খুলে পড়তে লাগল। আলাপের উৎসাহ তার নেই। অগত্যা এবার মিত্রানন্দ রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করল। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখল ভদ্রলোক বেঞ্চিতে নেই। সে কি! দ্রুতপদে ফিরে এল মিত্রানন্দ। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দূরে দেখল ভদ্রলোক বালি ভেঙ্গে অনেকটা নেমে গিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলে মাথা ধুচ্ছে। বইটা বেঞ্চির ওপর পড়ে রয়েছে। ইংরিজি বই। নাম—'মেণ্টাল ডিজিজ'—মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধীয় কোন বই। তাহলে ভদ্রলোককে সন্দেহ করার দরকার নাই। বরঞ্চ মিত্রানন্দ বুঝল এতক্ষণে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। কারণ একটা পাঁচ টাকার নোট ও খামে ভরা চিঠি বইয়ের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। বইটা তুলে ধরে তড়িৎগতিতেই টাকাটা বের করে নিল মিত্রানন্দ। সঙ্গের খামটাও পকেটস্থ করল। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে স্বর্গদ্বারের রাস্তা ধরে মন্দিরের দিকে বাঁক নিল। বইটা বেঞ্চির ওপর পড়ে রইল।......

এদিকে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নিয়ে শালবনের ভেতর ঢুকে মাটি খুঁড়ে রক্তমাখা ধুতি, জামা, গেঞ্জি, আণ্ডারপ্যাণ্ট সব বের করল।

এগুলি শালবনের অন্ধকারে মাটির তলায় পোঁতা ছিল দীর্ঘ পাঁচটি দিন। এমন কি, সাদা হাড়ের বাঁটওয়ালা রক্তমাখা ছুরির সন্ধানও মিলল। খালি মদের একটি বোতল জামার পকেটেই ছিল। বোতলটা বড় আকারের।

রক্তমাখা ধুতি থেকে সেই প্রয়োজনীয় অংশগুলো আল্ট্রা-ভায়লেট রে'-তে সযত্নে দীর্ঘসময় পরীক্ষা করে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে নেওয়া হল। উদ্দেশ্য, সায়ার নানা জায়গায়, গ্লাস স্লাইডের মধ্যে, টিউবের তুলোয় যে ঈষৎ হলদে ও ধূসর রঙের দাগ—'ইয়েলোয়িস্ গ্রে-স্টেন্স্'-পাওয়া গিয়েছিল, ধুতির মধ্যেও তাই পাওয়া যায় কি না দেখা। বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা কেমিক্যাল রি-এজেন্টের সাহায্যে ধুয়ে, শুকিয়ে, গরম করে নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হল। সর্বশেষে গ্রুপ নির্ধারণ করার পালা।

পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর জন্যেই অতি সংক্ষেপে এখানে বলে রাখি ফরেন্সিক লেবরেটারীতে বায়োলজি সেকশনে রক্ত, চুল, টিস্যু ছাড়াও 'সীমেন' ও 'স্পারমাটোজোয়া' পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সমাজে খুন করা যেমন অপরাধ এবং তার শাস্তির বিধান আছে, তেমনি 'ক্রিমিন্যাল অ্যাসাল্ট' অর্থাৎ অসহায় দুর্বল নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচারেরও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেটা প্রমাণ করার জন্যেই এধরণের নানারকম পরীক্ষা করা হয়। গ্রুপ টেস্ট করা হয়।

ধুতির 'সীমেনের' গ্রুপ মেয়েটির সায়াতে লাগা 'সীমেনের' গ্রুপের সঙ্গে এক—'আইডেন্টিক্যাল'। এর থেকেই বোঝা গেল খুনী চোপরানন্দ শুধুমাত্র নির্মমভাবে ধারালো ছুরির ঘায়ে মেয়েটিকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে তার বিকৃত কুৎসিত যৌন ক্ষুধাও চরিতার্থ করেছিল।

ধুতির মতো আণ্ডারওয়্যারেও 'সীমেনের' স্পষ্ট দাগ ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে তার গ্রুপও ধুতির সঙ্গে এক প্রমাণিত হল।

এছাড়া ধুতির মধ্যে কাঁচের গুঁড়ো, মেয়েটির মাথার কয়েকটা ছেঁড়া চুল সবই এক্জিবিট রূপে গণ্য করা হল।

পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে যে সেই ঘরটার মধ্যে রক্তমাখা মেঝের ওপর ভাঙা ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো পড়েছিল। সেগুলোর সঙ্গে ধুতির মধ্যেকার কাঁচের গুঁড়োগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা

করা হল। একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচের সূক্ষ্ম টুকরোগুলো সংগ্রহ করে নানাভাবে প্রমাণ করা হল, যে ধুতির কাঁচের গুঁড়ো—ভাঙা কাঁচের চুড়ির অংশ। দুই-ই অভিন্ন।

শালবনের গুপ্ত-স্থান আবিষ্কার হওয়ার দিনই গভীর রাত্রেই মেল ট্রেনের জন্যে অপেক্ষারত উদ্বিগ্নচিত্ত সত্যসুন্দর তেওয়ারীকে রিভলবারের ভয়ে পুলিশের কালো ভ্যানে উঠতে বাধ্য করল বিষণদাস ঠাকুর—ওরফে ছদ্মবেশী নির্ভীক সুযোগ্য সুদর্শন কর্মঠ সাব-ইন্সপেক্টার রামপ্রসাদ সিংহ। সারা রাস্তা সমস্ত ব্যাপারটাই তেওয়ারীজীর অদ্ভুত স্বপ্ন মনে হল। সেই নিরীহ বুড়বাক কিতাব-পড়নেওয়ালা গর্দভটা কিনা পুলিশ। দৃষ্টি তার কি ভীষণ তীক্ষ্ণ, চলার গতিতে বিদ্যুৎ। এবার সমস্ত রহস্যটাই তেওয়ারীজীর কাছে স্বচ্ছ হয়ে এল, রতনলাল মুন্সির সমস্ত গোপন আস্তানার খবর কে দিয়েছিল পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে? হোটেলের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার, একশ সাতান্নটা চোলাই মদের বোতল পাচারের কথা পুলিশের কানে উঠল কি করে? কি করে অত ভোরে পুলিশ খবর পেল শ্মশানঘাটে গাছের গায়ে লোক মরে আছে? আরো কতশত ঘটনা ভাবতে লাগল সত্যসুন্দর।

তাহলে কি চোপরানন্দ মিসির ধরা পড়েছে? তার লুকোনো মাল-পত্তর? হঠাৎ একটা কথা চিন্তা করায় শিউরে উঠল তেওয়ারী। তার নিজের ঘরের আলমারী, দেরাজ, ট্রাঙ্ক ভেঙে সমস্ত জিনিস চুরি করেছে নিশ্চয় বিষণদাস—ঐ সেই খুনের রাত্রেই। হায় ভগবান! কেন খুন দেখতে গেলাম রতনলালের? ফাঁকা ঘর পেয়েই বিষণদাস তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।

ঘামতে লাগল তেওয়ারী। অসংখ্য গোপন চিঠিপত্তর, চোরাই পিস্তল, নানা ভেজাল মাল, বিপুল পরিমাণ কালো টাকা। এমন কি, মীরাবাঈকে ভুলিয়ে কৌশলে এনে হত্যা করার কথা যে চিঠিতে লেখা ছিল, চোপরানন্দ মিসিরের সই করা সেই চিঠিটা পর্যন্ত চোরা-

গর্তের ভেতর থেকে বের করে নিয়েছে বিষণদাস। এতক্ষণে সবাই পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে পৌঁছে গেছে। রতনলাল ঠিক কথা বলেছিল—শালা ফরেন্সিকের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না কখনই।
—ওরা দুশমনের দুশমন। গাড়ির মোটা জালের ওপর কপাল ঠেকিয়ে মৃত্যু-ভয়ে কেঁদে উঠল তেওয়ারী।

পুরীর বিখ্যাত হোটেলের সামনে দাঁড়াল মিত্রানন্দ। ডাইরী খুলে নামটা দেখে নিল। না ঠিক আছে। ভদ্রলোকের নাম গোবিন্দদাস। মিত্রানন্দ হোটেলে খোঁজ নিয়েছে। অসুস্থ মানুষের টাকা কটা চুরি করা অবধি তার মনে শান্তি নেই। টাকা ফেরৎ দিতে হবে। সেই সঙ্গেই জানতে হবে ভদ্রলোকের পরিচয়। আলাপ করতে হবে। হয়ত সামান্য মানসিক রোগে ভদ্রলোক ভুগছে।

ইতস্তত করে সোজা দোতলায় উঠে এল মিত্রানন্দ। ভদ্রলোক ঘরে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। মিত্রানন্দ হঠাৎ ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক ব্যঙ্গ-মেশান হাসিতে বলল,

—ও—টাকাটা ফেরত দিতে এসেছেন বুঝি? খামটা?

আকস্মিক আক্রমণে মিত্রানন্দ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বলল, —হ্যাঁ—মানে—এলুম।

এবার ভদ্রলোক দৃঢ়স্বরে বলল—সাধুজিই কি আবার পাঠাল নাকি? তুমি এবার কি চুরি করবে—টাকাকড়ি? আমার কিছুই নেই। শুধু আছে পুলিশ—একবার খবর দিলেই ছুটে আসবে। বোসো—পালাচ্ছ কেন? তীর্থস্থানে সাধুসঙ্গে থাক, তাতেও চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে না?

মিত্রানন্দ সত্যিই পালাচ্ছিল। থামল। ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ম্যানেজার ছুটে এসে দুঃসংবাদ দিলেন—পুলিশ—এই হোটেল ঘেরাও করেছে—কি সর্বনাশ!

—পুলিশ? কেন—? মিত্রানন্দের মুখ পাংশু হয়ে গেল।

—কি করে জানব ছাই। যাই সব ঘরে জানিয়ে দি—

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েক জোড়া ক্রুদ্ধ বুটের আওয়াজ ওপরে উঠতে লাগল। হোটেলের মালিক দ্রুতপদে পাশের ঘরের দিকে ছুটে যেতে চাইলেন। কিন্তু পুলিশ অফিসার সশব্দে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—মিত্রানন্দ কোন্ ঘরে থাকে? আপনি কি মালিক?

হোটেলের ম্যানেজার পুলিশ অফিসারের প্রশ্নে ভয়ে ভয়ে বললেন —আজ্ঞে—হ্যাঁ। কিন্তু মিত্রানন্দ বলে কেউ নেই।

—আছে। আমরা খবর পেয়েছি—গোবিন্দদাস বলে কোন বোর্ডার আছেন কি? কোন্ ঘরে থাকেন?

—তিনি আছেন—এই তাঁর ঘর। কিন্তু মিত্রানন্দ?

—তাঁর ঘরেই থাকেন—। মিত্রানন্দের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ আছে। তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে,—কুইক্।

—আমারই নাম মিত্রানন্দ—। মিত্রানন্দ ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল। পুলিশ অফিসারের ডাকে সাত জন কন্‌ষ্টেবল উপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়াল। পুলিশ অফিসার বললেন,

—এই ঘর সার্চ হবে,—এই দেখুন ওয়ারেন্ট।

চমকে উঠে হোটেলের ম্যানেজার বিস্ফারিত চোখে পুলিশ অফিসারের হাতের কাগজের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সামান্য প্রতিবাদের স্বরে বলল,

—কিন্তু মিত্রানন্দ নামে কোন লোক আমার হোটেলে থাকে না। আপনি এ ঘর সার্চ করতে পারেন না। এই ঘর গোবিন্দদাসের। তার নামে তো কোন ওয়ারেন্ট নেই।

এবার পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্টের কাগজটা খুলে ম্যানেজারের সামনে ধরলেন—

—পড়ুন—। ইংরিজি নিশ্চয় জানেন—পড়ুন।

ম্যানেজার কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে চীৎকার করে উঠলেন,

—সে কি! তাহলে……। তাঁর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল।

—তাহলে আমাদের কাজ আরম্ভ করি, ম্যানেজারবাবু।

সাতজন কনস্টেব্‌ল্ ঘরটা তছনছ করতে লাগল। টেবিলের ওপর ছড়ানো জিনিষগুলো সরিয়ে একধারে সযত্নে সাজান বইখাতা টেনে মেঝেতে নামাল। খাটের বিছানা তুলে ফেলল। তোষক বালিশ সবই তুলে তুলে দেখতে হবে। বালিশের ওয়াড় খুলে বালিশগুলো ছিঁড়ে ফেললেন পুলিশ অফিসার। একটা, দুটো....। না কিচ্ছু নেই। কিন্তু পাশের লম্বা বালিশ ছিঁড়ে ফেলতেই বেরুল একটা ফটো। কার ফটো! আরও পাওয়া গেল দুখানা প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের টিকিট। পাটনা থেকে কেনা। তারিখ, বারোই সেপ্টেম্বর।

পুলিশ অফিসার কঠিন মুখে ঘরময় ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেওয়াল আলমারী খুলে তাকগুলো দেখলেন। একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্ একখানা খাতার ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করল। খামের ওপর নাম লেখা রয়েছে। না—মিত্রানন্দের নাম নয়। নামটা গোবিন্দদাসের।

পুলিশ অফিসার ফটোটা দেখিয়ে বললেন,—ম্যানেজারবাবু, এই ফটোটা হচ্ছে সে-ই মেয়েটির যে খুন হয়েছে। এই টিকিটের তারিখ হচ্ছে, খুনের আগের দিনের। আর—

পুলিশ অফিসার হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বললেন।

—সিপাই—হাতকড়া লাগাও—কোমরে দড়ি—। একজন কনষ্টেব্‌ল্ ছুটে এসে আদেশ পালন করল। অফিসার সহাস্যে বললেন,

—ম্যানেজারবাবু, খুনী মিত্রানন্দ নয়—খুনী হচ্ছে এই গোবিন্দ-দাস—তাই সিপাই গোবিন্দদাসের হাতেই কড়া লাগিয়েছে।

—এ্যাঁ! গোবিন্দদাসবাবু খুনী—!

—হ্যাঁ, আরও বিস্মিত হবেন, এ কথা শুনে, যে গোবিন্দদাস এঁর আসল নাম নয়। আসল নাম—চোপরানন্দ মিসির একটি হত্যা-কাণ্ডের প্রধান।

চোপরানন্দ মিসির চমকে উঠল। পুলিশ অফিসার পকেট থেকে মিত্রানন্দের চুরি করা চিঠিটা বের করে বললেন,—চোপরানন্দ মিসির, তেওয়ারীর লেখা শেষ চিঠিটা অনেক কাজে দিয়েছে আমাদের। আপনাকে চিনতে তাই ভুল হল না। সময়ও কম লাগল।

চোপরানন্দ মিসিরকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফরেন্সিক লেবরেটারীর কাজ বেড়ে গেল। অর্থাৎ আসল কাজ আরম্ভ হল।

ঘটনাস্থলে সংগৃহীত বস্তুগুলি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়ে গেছে লেবরেটারীতে। এবার খুনীর পায়ের ছাপ, তার রক্তের গ্রুপ, অন্যান্য সন্দেহজনক সব কিছুই পরীক্ষা করে তুলনামূলক ভাবে বিচার করা হবে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেখা হবে, ঘটনাস্থলে পাওয়া চিহ্নগুলো খুনীরই কিনা।

চোপরানন্দের পায়ের ছাপ এবং শ্মশানে তোলা পায়ের ছাপ যে এক—আইডেন্টিক্যাল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ফুট-প্রিন্ট পরীক্ষায়। এর পর রক্ত—ঘরের ভেতরে যে রক্ত পাওয়া গিয়েছিল সেই রক্ত পরীক্ষা করে আগেই বোঝা গিয়েছিল সেই ঘরের ভেতর মেয়েটির রক্ত ছাড়াও আর একজনের রক্ত রয়েছে। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন গ্রুপের রক্ত লেবরেটারীর পরীক্ষাতে ধরা পড়েছিল। এবার চোপরানন্দের রক্ত পরীক্ষা করা হল। বলা বাহুল্য, তার রক্তেরই গ্রুপের সঙ্গে ঐ রক্ত 'এক' বলে অভিজ্ঞেরা মত দিলেন। এছাড়া চোপরানন্দের ডান হাতের ওপরের দিকে বেশ খানিকটা জায়গার চামড়া উঠে গেছে। মনে হল কে যেন ছিঁড়ে তুলে নিয়েছে। পরীক্ষা করে আগেই দেখা গেছে, মেয়েটির মুখের মধ্যে বেশ কিছুটা মাংসের টিস্যুর টুকরো ছিল। এখন অভিজ্ঞেরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, মেয়েটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষ পর্যন্ত চোপরানন্দের হাতের মাংস দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল।

কারণ মেয়েটির মুখের মধ্যে মাংসের টিস্যু আর চোপরার ক্ষত-স্থানের মাংসের টিস্যু—'আইডেন্টিক্যাল' প্রমাণিত হল। এ ছাড়া

চোপরানন্দের সীমেনের গ্রুপ, মীরাবাঈয়ের সায়াতে লেগে থাকা সীমেনের গ্রুপ আইডেন্টিক্যাল।

'কনফেশন্ রুমে' মীরাবাঈ হত্যার আসল কাহিনী উদ্ঘাটিত হল তেওয়ারীর সরল স্বীকারোক্তিতে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে বলতে লাগল তেওয়ারী।

—মীরাবাঈ জাতিতে দো-আঁসলা, বাবুজি—. বহুৎ সুন্দরী, শিক্ষিতা বড় ঘরের লেড়কি। কলেজে পড়ত, বহুৎ লেড়কা পিছে পিছে ঘুরত। আমরাও ছিলাম—।

সত্যসুন্দর তেওয়ারী পুরোনো ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে লাগল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের কাছে। আঠারো বছর আগেকার সে কাহিনী।

—আমরা দুজন—আমি আর রতনলাল। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

সত্যসুন্দর তেওয়ারী আবার থামল। পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনে তন্ময় হয়ে গেল।···

সত্যসুন্দর, রতনলাল আর চোপরানন্দ একই সঙ্গে একই কলেজে পড়ত।

মীরাবাঈ সেই কলেজের নাম-করা ছাত্রী। খেলাধুলোয়, সাঁতারে, গানে, নাচে সে ছিল অদ্বিতীয়া। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হত। মীরাবাঈও চাইত সেটা। পোশাকে, চালচলনে, আচরণে দিন দিন তার অসংযত ভাব বাড়তে লাগল। শেষে এক সময়ে সকলের ওকে একেবারে অসহ্য মনে হল, সবাই এড়াতে চাইল।

বলে চলেছিল তেওয়ারী,

—চোপরানন্দ মিসির অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র, বিদ্বান ও লাজুক ছেলে। সবাই ভালবাসত কলেজে। মীরাবাঈ ওর সঙ্গে আলাপ জমাল। গান শোনাল, নাচ দেখাল। রতনলাল হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরল। এতে জেদ বাড়ল চোপরানন্দের। আমাদের বারণ সত্ত্বেও

চোপরানন্দ মীরাবাঈকে শেষে বিয়ে করে ফেলল। আমরা ভাবলাম, হয়তো মীরা বিয়ের পর সামলে নেবে। চোপরার বাবা বড়লোক। কলেজ ছেড়ে আর দেখা হয়নি, বাবুজি। শুনতাম, চোপরা পাটনাতে মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। রতনলাল ব্যবসা করে খুব পয়সা রোজগার করছে। আমি চাকরি পেলাম না। বাবার এই হোটেলেই বসলাম। ব্যবসার তো কিছুই জানি না, কিছুদিন পরেই বুঝলাম, এ ব্যবসা অসৎ। এখানে সত্যের পথে পয়সা আসে না বাবুসাব। ভাবলাম পালাই। একদিন পালালাম কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন। কিন্তু হাতের পয়সা ফুরোল, তাই ফিরে এলাম। বাবা বললেন,—হোটেল চালাও।

—বাবুসাব, পাপের একটা ক্ষমতা আছে, মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। তার শিক্ষা, ধর্ম, রীতিনীতি সব কিছু। আমি ধীরে ধীরে চোর হতে শিখলাম। বহুৎ পয়সা এল। বড়লোক হলাম, বাবা মারা গেলেন। একলাখ নব্বুই হাজার টাকা পেলাম। কাশী—বৃন্দাবন—কলকাতায় অনেক বাড়ি করলাম। পাটনাতে ভি বাড়ি কিনেছি।

এক বছর আগে হঠাৎ আমার খোঁজ করে করে এখানে চোপরা এল। থাকল। শুনলাম, মীরাবাঈ চোপরাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় জানেন বাবুসাব? রতনলালের বাড়ি। রতনলাল বেইমান বদমাস হয়ে গেছে। মদ খায়—বদ মেয়েছেলে নিয়ে হৈ হৈ করে। সে-ই জাল ফেলে মীরাবাঈকে নিয়ে গেছে। মীরাবাঈয়ের চরিত্র ছিল বদ। চোপরানন্দ ভুল করে মীরাবাঈকে বিয়ে করেছিল। ও ঠকেছিল বাবুসাব। চোপরানন্দ পাটনাতে চাকরি করত। তাই এক সপ্তাহ হোটেলে থেকে সে চলে গেল। অনেক চিঠি লিখত। রতনলাল ভি আসত হোটেলে—খানাপিনা করত। অনেক পাপ করত সে আর তার গল্প করত। আর—।

তেওয়ারী থামল।

পুলিশ অফিসার ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর দিকে চেয়ে প্রশ্ন

করলেন,—রতনলাল তো আসত চোলাই বেআইনী মদ নিয়ে বেচতে, তাই না? সেই মদ চালান দিত শহরের হোটেলে। ধরা-ও পড়েছে কতবার পুলিশের হাতে।

তেওয়ারী লজ্জিত হয়ে বলল,—সবই তো জানেন বাবুসাব। আমার গোপন চিঠিপত্তর সবই বিষণদাস নিয়ে গেছে। পাপ চাপা থাকে না. হুজুর।

—তারপর? তারপর আবার চোপরা একদিন রাতে তোমার হোটেলে এল, ধর, মেয়েটি খুন হবার একমাস আগে। তাই না?

তেওয়ারী চমকে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে নিল। মৃদু হাসলেন বিশেষজ্ঞ। বললেন, —তেওয়ারীজী, চোপরা এসে বলল, মীরাবাঈ পাটনায় গিয়ে চোপরার হোটেলে যাতায়াত শুরু করেছে, আর আবার তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধও করেছে। কিন্তু চোপরা রাজি হয়নি। সে বাজারের বদ মেয়েছেলেকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না। তার চাকরিতে ইজ্জত আছে—সোসাইটিতে সম্মান আছে। কিন্তু মীরাবাঈ জানাল—রতনলাল তাকে ত্যাগ করেছে। চোপরা তবুও রাজি হল না—আরো খবর শুনবে?

—আমি তো জানি, আপনারা এনকোয়ারী করে সবই বের করেছেন। এটা তো আপনাদের ডিউটি। আমাদের মতো ক্রিমিন্যালকে গলায় ফাঁসি লাগাবেন। তবেই তো সমাজ বাঁচবে— দুশমন বিলকুল মরবে।

তেওয়ারী আবার সুরু করলো গল্প, একটু থেমে।

—মীরাবাঈ আসলে চরিত্রের শ্লীলতাটুকুই হারিয়েছিল, সে খবর চোপরার অজানা ছিল না। পাটনার যে ফ্ল্যাটে চোপরা থাকত সেখানে রোশনলাল কাঞ্জিলাল নামে এক ধনী জুয়েলারকে দেখে মীরাবাঈ চমকে ওঠে।

রোশনলালের কাছ থেকেই চোপরানন্দ মিসির জানতে পারে যে

মীরাবাঈ তার সঙ্গে এক মাস বম্বের একটা ফ্ল্যাটে ছিল। প্রমাণ স্বরূপ রোশনলাল তাকে মীরাবাঈয়ের লেখা চিঠি দেখায়। ফটো দেখায়। এরপর আর কোনমতেই চোপরা মীরাবাঈকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে রাজী হল না।

মীরাবাঈ যখন দেখল তার সব চাতুরী ফাঁস হয়ে গেছে তখন সে বাঁচার জন্যে অন্য পথ ধরল। চোপরার স্যুটকেশের মধ্যে মীরাবাঈয়ের লেখা চিঠি মিলল। মীরাবাঈ চোপরাকে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না। তার নিজের জীবনের মতো সে চোপরার জীবনও ধ্বংস করে দেবে। এই তার পণ।

মীরাবাঈ হঠাৎ চোপরার ফ্ল্যাটে গিয়ে একদিন ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করল। নিজেকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিতে চোপরাকে চাপ দিতে লাগল। চোপরা বুঝল, তার মান-সম্ভ্রম-শান্তি সবই খোয়া গেল। তার চরিত্র সম্বন্ধেও ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা সন্দেহ করতে লাগল। কেউ কেউ উপদেশচ্ছলে স্ত্রীকে ঘরে নেবার পরামর্শ দিলেন।

অসহায় চোপরানন্দ বাধ্য হয়ে শহরের নাম-করা জায়গার এই ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে গেল। কিন্তু তাতেও রেহাই মিলল না। রাহুর দৃষ্টি তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল শহর থেকে গ্রামে, মাঠে, ঘাটে প্রান্তরে।

একদিন মীরাবাঈকে হঠাৎ আপিসে দেখে চমকে উঠল চোপরা। বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে সে আপিসে সুনাম অর্জন করেছে। সৎ-চরিত্রের মানুষ বলে খ্যাতি লাভ করেছে। সবাই জানে সে অবিবাহিত। নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে চোপরানন্দ। অনুরোধ করে, মিনতি করে মীরাবাঈকে। সে চলে যাক্। কিন্তু মীরাবাই ক্রুর। সে চায় স্ত্রীর মর্যাদা। কিন্তু একজন ব্যভিচারিণীকে চোপরা স্ত্রীর সম্মান দিতে পারে না। মীরাবাঈ রূপোপজীবিনী। বহু-পুরুষ ভোগ্যা। তার ঘরে নারায়ণ আছে। ভগবান তাকে

ক্ষমা করবেন না। মীরাবাঈকে সে কোনমতে গ্রহণ করতে পারে না।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিষময় ফল ফলল। সবার সামনে মীরাবাঈ চোপরার সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে প্রচার করল। এও বলল, যে চোপরা তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। তার জীবন ধারণের জন্যে কোন খরচাও দেয় না। সহকর্মী, উর্দ্ধতন, অধস্তন কর্মীরা সবাই হতভম্ব। দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা সুনাম জলাঞ্জলি দিয়ে চোপরানন্দ শেষ পর্য্যন্ত নিরুপায় হয়ে মীরাবাঈকে নিয়ে সত্যসুন্দর তেওয়ারীর হোটেলে উঠল। তেরোই সেপ্টেম্বর। আসার আগে সে তেওয়ারীকে চিঠি লিখে সব জানাল। মীরাবাঈকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে বলে কথা দিল। মীরাবাঈ খুসি হলো। চোপরার সঙ্গে হোটেলে যেতে সে রাজি হল। কয়েকদিনের ছুটি চেয়ে চোপরা আপিসে দরখাস্ত করে দিল বারোই সেপ্টেম্বর।

মীরাবাঈয়ের ওপর চোপরানন্দের একটা দুর্বলতা যে ছিল না তা নয়। তাই ট্রেনে আসতে আসতে হয়তো কিছুটা মত বদলেছিল। শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে তার অপমান, আপিসে সহকর্মীদের ব্যঙ্গ,বিদ্রূপ হাসি সব কিছুই সে ভুলে গিয়েছিল। মীরাবাইয়ের বদচরিত্র সত্বেও সে মনে মনে তাকে ক্ষমা করেছিল। বহুদিনের সুপ্ত জৈব কামনা তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাকে দূর করে জেগে উঠেছিল। তাই বলা চলে শ্মশানঘাটের দিকে নির্জনে বেড়াতে যাওয়ার পেছনে তার হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল না। তার প্রমাণ—অস্ত্রটা। সামান্য একটি বড় ধরনের ঐ ছুরি সে তার আপিসে পেনসিল কাটার কাজেই ব্যবহার করত। একথা সহকর্মীদের জবানবন্দিতে পাওয়া গিয়েছিল। সাদা হাড়ের বাঁটওয়ালা ছুরিটা তারা সনাক্ত করেছিল। সেই ছুরিটা সব সময়েই তার শার্টের পকেটে থাকত। সহকর্মীরা হাসত, বলত,—চোপরাজী, ঐ ছুরি দিয়ে কি গুণ্ডা মারবে না কি? একটা ছোরা রাখ, কাজ

হবে। স্টেনোগ্রাফার চোপরানন্দ গম্ভীর হয়ে বলত,—না হে ব্রাদার, প্রিভেন্‌শন্‌ ইজ বেটার ছ্যান কিয়োর।

কিন্তু যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির পর অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতিক্রিয়া তার শরীরে ও মনে দেখা দেয়। সেই ঘৃণা আবার জেগে ওঠে। যে বদ কুশ্রী চরিত্রের গণিকা তার পৌরুষ, তার মান-সম্মান, মর্য্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে তাকে সে সুস্থ ভাবে বাঁচতে দেবে না। তার সুনাম, শান্তি যেমন করে মীরাবাঈ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কলুষিত করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই চোপরানন্দও মীরাবাঈয়ের ঐ সুন্দর দেহ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ করে দেবে; মুখটা বিকৃত করে দিয়ে দেখবে মীরাবাঈয়ের রূপগর্বিত মনটা কি ভাবে বিবর্ণ পঙ্গু বিকলাঙ্গ হয়ে ছটফট করে। কিসের দম্ভে সে সমাজ সংসারে সুখে শান্তিতে ঘুরে বেড়াবে। আরো কতশত পুরুষের জীবন নষ্ট করবে। শেষ পর্যন্ত তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মীরাবাঈকে নৃশংসভাবে হত্যাই করা হল। আশ্চর্য্য! মীরাবাঈ কি তার মৃত্যুদূতকে নিজেই খুঁজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রতনলাল? তাকে খুন করল কে? নিস্তব্ধ আদালতর মুখের ওপর প্রশ্নটাকে ছুঁড়ে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড পাবলিক প্রসিকিউটর নীচু হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর রঙিন একটা চিঠি তুলে নিয়ে বললেন—এই চিঠি—মানে, এই চিঠির লেখক। প্রসিকিউটর তেওয়ারীর দিকে চাইলেন। মাথা নীচু করে তেওয়ারী তখন আত্মমগ্ন। সকলের দৃষ্টি তেওয়ারীর ওপর পড়ল। পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন,—না—তেওয়ারী নয়। মাতাল অবস্থায় রতনলালকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে ঐ চোপরানন্দ মিসির। ভুলটা আসলে করেছেন সাব-ইন্সপেক্টার রামপ্রসাদ সিংহ ওরফে বিষণদাস ঠাকুর। ঐ দিন রাত্রে চোপরানন্দ সবার অলক্ষ্যে এসে তেওয়ারীর হোটেলে ঢোকে ও রতনলালের ঘরে লুকিয়ে থাকে। পরে অতর্কিতে রাতের অন্ধকারে রতনলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে রতনলালের হাতে ছিঁড়ে চলে আসে

চোপরানন্দের মাথার চুলের গুচ্ছ। দুজনের লড়ায়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রতনলাল নিহত হয়। তার মৃতদেহ একাই বয়ে নিয়ে যায় সে শ্মশানে।

ফরেন্সিক তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, মৃত রতনলালের বাঁ হাতের মুঠোতে যে চুলের গুচ্ছ পাওয়া যায়, তা মিলেছে চোপরানন্দের চুলের সঙ্গে—তেওয়ারীর চুলের সঙ্গে নয়।

কোন এক শব্দে আচমকা সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তেওয়ারীর। সে লক্ষ্য করে দেখে যে দ্রুতগতিতে চোপরানন্দ রতনলালকে কাঁধে করে দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করে চোপরানন্দকে, পাপের সাক্ষী হয়ে থাকে। তারপর সে ফিরে এসে দেখে তার ঘরের ট্রাঙ্ক, আলমারী, দেরাজ সব কিছু ভাঙা। কিন্তু সে এই চুরির কথা পুলিশকে জানাতে সাহস করেনি। তেওয়ারীর হোটেলে চোপরানন্দ কবে আসবে তা লেখেনি তবে সে যে রতনলালকে খুন করবে সে কথা চিঠিতে পরিষ্কার জানিয়েছিল। এ চিঠিটা যে ঐ চোপরানন্দেরই লেখা তা হ্যাণ্ড্‌রাইটিং এক্সপার্ট প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও রতনলালের গলাতে যেসব আঙুলের ছাপ আছে তাও চোপরানন্দের।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বন্ধু রতনলালকে চোপরানন্দ খুন করল কেন? এবং এত নিষ্ঠুর পন্থা নিলই বা কেন?

চোপরানন্দ মিসিরের বাবা খুব বড়লোক ছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি চোপরাকে ছেলে বলে স্বীকার করেননি। কারণ, তাঁর অমতে চোপরানন্দ মীরাকে বিবাহ করেছিল। চোপরা স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করে, সামান্য মাইনে। ফলে সংসারে প্রায় খিটমিট্ বাধত। মীরাবাঈ চেয়েছিল অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনের অবাধ স্রোতে গা ভাসাতে। কিন্তু তা যখন হল না, তখন সে হাঁপিয়ে উঠল। এদিকে রতনলাল মাঝে মাঝে আসত চোপরার বাড়ি। ব্যবসায়ের কাঁচা পয়সা, কালোও বটে, বিনা দ্বিধায় ওড়াত। মোটা টাকার জিনিস মীরাকে উপহার দিত!

এখানে বলে রাখি, মীরাবাঈয়ের রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বোধ করি জন্ম থেকেই ছিল। এবার আরম্ভ হল, সেই চিরাচরিত 'ট্রাই-অ্যাঙ্গেল স্টোরী'। মীরাবাঈ ঘর ছাড়ল। এর কিছুদিন পরে চোপরানন্দ বদলি হল পাটনার আপিসে। সৎ-চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠ সুযোগ্য কর্মচারী হিসেবে চোপরানন্দ ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সহকর্মীরা সকলে তাকে একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে ভালবাসত। মহিলারা ঠাট্টা করে বলত—মহাদেব। মনে মনে শ্রদ্ধা করত! সম্ভ্রম জানাত। চোপরানন্দ তার একমাত্র বন্ধু সত্যসুন্দর তেওয়ারীকে প্রায়ই চিঠি লিখত। মীরাবাঈয়ের গৃহত্যাগের খবরও চিঠিতে জানাল চোপরানন্দ। সত্যসুন্দরও একদিন লিখল, রতন মীরাকে ব্যবসায়ের মূলধন করেছে। ঐ পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে সে বিভিন্ন মহলে ঘোরে ও মোটা মোটা টাকার কনট্রাক্ট যোগাড় করে।

চোপরানন্দ সে চিঠি পেয়ে বিচলিত হল না। মীরাবাঈয়ের সম্বন্ধে সে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না। কিন্তু তবুও বুকের কোথায় যেন একটা জমাট ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। সারা রাত ঘুমোতে পারল না।

তারপর নাটকীয় ভাবে ঘটে গেল অনেক ঘটনা। সে সব পরিচ্ছেদের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ঘটনাচক্রে চোপরানন্দ মিসির—মীরাবাঈ ও রতনলাল দু'জনকেই হত্যা করল। তার প্রমাণ সবই আদালতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রক্ত, চুল পায়ের ছাপ, চিঠির লেখা—সবই চোপরানন্দের। আদালত প্রশ্ন করলেন,—বাট্ হোয়াট্ অ্যাবাউট্ সত্যসুন্দর?

প্রসিকিউটর বিনীত ভাবে বললেন,—তেওয়ারী প্রতিটি খুনের সাক্ষী থাকলেও সে খুন করেছে একথা বলার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সে অবশ্যই অসামাজিক আইন-বিরুদ্ধ অনেক কাজ করেছে, পুলিশের কাছে সত্য গোপন করেছে। তবুও সে যে রতনলাল, এমনকি, মীরাবাঈয়েরও মৃত্যু চেয়েছিল—তা নয়।

একটা চিঠিতে সে চোপরানন্দকে লিখেছিল,—ভুলো না, মীরা তোমার স্ত্রী। তাকে তোমার সংসারে রাখতে পারনি, তার জন্যে তোমার দোষও কম নয়। ওকে ফেরাতে চেষ্টা করো। মীরাকে গ্রহণ করো।

পাহারাধীন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান নতশির ম্লানমুখ তেওয়ারী মাথা নাড়ল।

প্রসিকিউটর থামলেন। মৃদু হেসে বললেন,

—ট্রুথ্ ইজ্ স্ট্রেঞ্জার স্থান্ ফিক্‌শান মী লর্ড। প্রেম, বিচ্ছেদ, ঘৃণা ও পরিণামে মৃত্যু একটি সাজানো নাটকীয় ঘটনা মনে হয়। মনে হয়, কোন নাট্যকার বুঝি সযত্নে নিপুণভাবে ঘটনার পর ঘটনার স্রোত এনে জীবনতরী ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু বাস্তব সংসারেও এ ঘটনা ঘটে। চোপরানন্দের মতো হতভাগ্য স্বামীর খোঁজ মেলে। আমাদের মধ্যেও এই রকম শত শত মীরাবাঈ, রতনলাল—জন্মাচ্ছে, মরছে। আর তাদের কাহিনী লেখা থাকছে আদালতের গোপন নথিপত্রে। পরিশেষে অব্যক্ত বেদনার নীরব অভিব্যক্তিতে একটা কথাই তারা সমাজ সংসারে মানুষের বিভ্রান্ত মনের দরবারে লিখে রেখে যায়—'ক্রাইম ডাজ্‌ন্ট্ পে।'

আদালত নিস্তব্ধ।

প্রসিকিউটর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—চোপরানন্দ মিসিরের কিছু বলার আছে কি? কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ?

চোপরানন্দ জানলার বাইরে দূরে চেয়ে রইল—নির্বাক নিস্পন্দ।

হঠাৎ তার চাপা স্বর শোনা গেলো,

—মানুষের আদালতে নয়। আমি সেই আদালতে বলব, যেখানে আত্মার বিচার হবে। সেটা ভগবানের আদালত। সেখানে আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, সেই ভগবানের আদালতে আমি হব নির্দোষ—মুক্ত।

সেসান্সের বিচারে চোপরানন্দ মিসিরের মৃত্যুদণ্ড হয়। তবে হাইকোর্ট চোপরানন্দকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

৪



বেলা এগারোটা হবে।

বিরাট কালো পুলিশ ভ্যানটা ফরেন্সিক লেবরেটারীর সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ও ইনসপেক্টার দুজনেই দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে এলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের ঘরে ঢুকে বললেন—

—গুড্ মর্নিং স্যার।

বিশেষজ্ঞ টেবিলের উপর ছড়ান কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে স্মিত হেসে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন—

—গুড মর্ণিং অফিসার, বসুন।

উভয়েই বসলেন। বিশেষজ্ঞ বল্লেন,—আজকের খবরের কাগজে একটা খবর দেখে বড়ই অদ্ভুত লাগল। তাই টেলিফোনে ডাকলুম।

—কোনটা স্যার? কোন খবরের কথা বলছেন? পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যু তো? দেখেছি, সকালের পেপারে বেরিয়েছে,—পূর্ণেন্দু মিত্র মজুমদার।

—কাগজে মৃতের নাম নেই। তবে রহস্যজনক মৃত্যু বলছে কাগজওয়ালারা। আপনি নাম জানলেন কি করে?

ডেপুটি কমিশনার মৃদু হেসে বললেন—

—খবরটা আজ পেপারে বেরুলেও ঘটনাটা ঘটছে পরশু!

—পরশু! চমকে ওঠেন বিশেষজ্ঞ। বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন পুলিশ অফিসারের দিকে।

—হ্যাঁ স্যার। আমার এলাকাতেই তো ঘটেছে। অন দি স্পট্ এন্‌কোয়ারী করে ফিরে এসে পুলিশ ইন্সপেক্টার রিপোর্ট দিয়েছেন যে কেসটা হচ্ছে অর্ডিনারী।—পূর্ণেন্দুবাবু বিয়েবাড়ির আসরে খেতে বসেই হার্টফেল করেছেন। হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়েই মারা গেছেন। কাগজ-ওয়ালারা তাই ঘটনাটার ওপর মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। এটা, স্যার, একটা দুর্ঘটনা—অ্যাক্সিডেণ্ট; ইট্ ইজ্ এ ডেথ্ বাই করোনারী স্ট্রোক্। এটা তো আজকাল ঘরে ঘরে ঘটছে। আমরাও স্যার গুরুত্ব দিচ্ছি না। তাছাড়া পেপারে দুর্ঘটনা ছোট্ট করেই বেরিয়েছে। আসল ঘটনাটা আপনাকে বলা হয়নি। শুনবেন স্যার?

—হ্যাঁ, আসল ঘটনা কি, অফিসার? হিস্ট্রি অফ্ দি কেস্‌-টা বলুন!

—স্যার, পূর্ণেন্দুবাবু ছিলেন অন্ধ। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই ঐ এলাকার থানার ইন্‌চ-ার্জ ইন্সপেক্টার ভৌমিক ঘটনাস্থলে যান। বিয়েবাড়ি। শুধু বিয়ের জন্যই বড় বড় বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা শহরে আছে। সেই রকম একটা বাড়ি। বড় বড় দশ বারো খানা ঘর। বড় ছাদ। সেখানেই খাওয়ানোর আয়োজন হয়েছিল। পূর্ণেন্দুবাবুর ছোট বোনের বিয়ে ছিল। পূর্ণেন্দু-বাবু তো অন্ধ। তাই তাঁর করণীয় কিছু নেই। বাড়ি ভর্ত্তি লোকজন।

প্রচুর আত্মীয় স্বজন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সবাই এসেছিলেন। সন্ধ্যে থেকেই একটার পর একটা ব্যাচ খেতে বসেছে। এদিকে রাত বাড়ছে। একটা ব্যাচে আত্মীয়রা কেউ কেউ খেতে বসেছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুকেও সেই ব্যাচে বসান হয়েছিল। অন্ধ মানুষ তিনি। এগারটা বেজে গেছে। তাই আর রাত করা তাঁর উচিত হবে না।

—খাওয়া চলছিল ঠিকই। হঠাৎ······এই দুর্ঘটনা—! ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠেই কলাপাতার ওপর পড়ে যান, হাত থেকে জলের গ্লাস পড়ে যায়।

ডেপুটি কমিশনার একটু থামলেন।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসা করলেন :—

—তাহলে জল খেতে গিয়েই অ্যাক্সিডেণ্ট্টা ঘটেছে বলছেন ?

—হ্যাঁ স্যার ! স্রেফ করোনারী অ্যাটাক্।

—পূর্ণেন্দুবাবুর মৃতদেহ পোষ্ট-মর্টেমে পাঠান হয়েছে, কাগজের খবরে পেলুম। কিন্তু অন্য জিনিষ পত্তর ? জামা, কাপড়, কলাপাতা ভাঁড়, খুরি, গ্লাশ এ সব ? কিছুই কি রাখেননি ?

—স্যার, শুধু জামা কাপড় রাখা হয়েছে। অন্য জিনিষ পত্তর কিছু সীজ করা হয়ে ওঠেনি। কীই বা করার ছিল ওখানে ? আমরা যখন গেছি তখন 'বডিটা' তেতলার ছাদ থেকে একতলায় নামানো হয়ে গেছে। ডাক্তার পাশেই ছিলেন—ওঁদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসা করলেন,—তিনিও কি নিমন্ত্রিত ছিলেন ?

—হ্যাঁ। অনেক পরীক্ষা করেও উনি মৃত্যুর কারণটা ধরতে পারলেন না। তাই পোষ্ট্মর্টেমে পাঠানো হল। উনি ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতে সাহস করলেন না।

কী যেন চিন্তা করে বিশেষজ্ঞ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—

—আচ্ছা, পূর্ণেন্দুবাবু কি বমি করেছিলেন ? মুখ দিয়ে কি ফেনা বেরিয়েছিল ?

ডেপুটি কমিশনার ইতস্তত করে বললেন—

—কৈ না……! সেটা তো লক্ষ্য করা হয়নি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—

—ডেড্ বডিটা তাড়াতাড়ি সরানোর দিকেই লক্ষ্য ছিল, স্যার। ভদ্রলোকের স্ত্রী, বুড়ো বাবা, ছোট ভাই সকলেই এত অস্থির হ'লেন, উন্মাদের মত হয়ে পড়লেন যে 'বডি'টা ওখানে বেশীক্ষণ রাখার উপায় ছিল না। তাই ডাক্তারবাবুর সাহায্যে 'বডি'টা পাঠিয়ে দিলুম মর্গে। কী প্যাথেটিক্ সীন্ কি বলব—স্যার—।

—স্ত্রী কাঁদছেন। বাবা, ভাই। আত্মীয়রা সবাই মর্মাহত হয়ে পড়েছেন।

—অফিসার, আহারের অবশিষ্ট অংশ, মাটির ভাঁড়, গেলাশ এ সন্ধান তো করেননি? উপায় ছিল না,—না?

এবার লজ্জিত হয়ে ডেপুটি কমিশনার বললেন,

—না স্যার। সে সব করার সুযোগ ছিল না।

—ইন্সপেক্টার যখন যান তখন ছাদ পরিষ্কার ধোয়া মোছা হয়ে গিয়েছিল। অন্য ব্যাচ বসেছিল খেতে। অত লোকের পায়ের ধাক্কায় মাটির ভাঁড়, জলের গেলাস কোথা থেকে কোথায় গেছে। তখন আর আলাদা করে বেছে নেওয়ারও উপায় ছিল না।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। খানিকটা স্বগতোক্তির মতই তিনি বললেন,

—ভদ্রলোক চীৎকার করেই মুহূর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন ও মারা গেলেন।

—নিশ্চয়ই বুকে খুবই ব্যথা হচ্ছিল—তাই। অ্যাটাক্টা বড় জোর ছিল, স্যার।

—না। বিশেষজ্ঞের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ডেপুটি কমিশনার চমকে উঠলেন।

বিশেষজ্ঞ একটু থেমে বলে উঠলেন,—ইট্ ইজ্ এ কেস অফ্ মার্ডার। মার্ডার বাই পয়জ্‌নিং। বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

চুপ করে রইলেন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। তিনি হতবাক্। বিস্ময়ে দুটি চোখের মণি এধার ওধার ঘুরতে লাগল।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের অনুমান সহজে মিথ্যা হবার নয়। এ কথা তিনি জানেন। তাই তাঁকে রীতিমত চিন্তামগ্ন দেখা গেল।

তাহলে পূর্ণেন্দুবাবু খুন হয়েছেন। কে খুন করল? আত্মীয়রা কেউ? প্রতিবেশী? বন্ধু-বান্ধব? ভাই? বাবা? স্ত্রী?

কে হত্যা করতে চাইবে ঐ অসহায় অন্ধ লোকটি কে? কি তার লাভ? খেতে বসিয়ে হত্যা করবে—এমন নিষ্ঠুর কে?

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ উঠে পড়লেন। বললেন,—আবার স্পট্ এন্‌কোয়ারী করতে হবে। তারপর মেডিক্যাল রিপোর্ট স্টাডি করতে হবে। মনে হচ্ছে, এটা ইউ-ডি কেস—আন্‌ন্যাচারাল ডেথ্।

ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ সসম্ভ্রমে বললেন,—তাহলে, স্যার, এখনিই যাবেন কি? বিশেষজ্ঞ চলতে চলতেই বললেন,—হ্যাঁ চলুন—আই এ্যাম্ রেডি।

পুলিশ জীপ চলল।

বাড়ীর দারোয়ানকে হতচকিত করে পুলিশ জীপখানা সোজা ভেতরে ঢুকে গেল।

বিরাট বাড়ি। দুপাশে সারি সারি ঘর। জীপ গাড়ী থেকে নামলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ডেপুটি কমিশনার অফ্ পুলিশ। সার্চ করতে হবে শুনে দারোয়ান চাবি দিয়ে দিল।

ফাঁকা বাড়ী। ধোয়া মোছা। সন্দেহ করার মতো কোন জিনিষ নেই। ভেতরের সব ঘর খোলা, সব ঘর পরিষ্কার—শুধু একটা ঘর বন্ধ। তালা দেওয়া। দারোয়ান জানাল ঘরটাতে বাড়ীওয়ালার পুরোনো জিনিসপত্তর থাকে। ভাঙাচোরা—বিক্রির জন্যে রাখা। ঘরটার ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকে না বিশেষ। কোণের ঘর। চাবির দরকার ছিল না। তালাটা খোলাই ছিল।

কড়া ছুটো, শুধু কোনরকমে লাগানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, তালাটা বন্ধই আছে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বিস্ময় প্রকাশ করল। তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ খুলেছিল দরজাটা। কে খুলেছিল, তার জানা নেই।

বড় নোংরা ঘর। বড় বড় লোহার জিনিস। ভাঙ্গাচোরা টেবিল চেয়ার, খালি শিশি বোতল। ভাঙ্গা তেলের টিন। ছেঁড়া কাগজ পাকিয়ে পাকিয়ে গুলি করে ফেলা অজস্র। দেশলাই কাঠি, চার পাঁচটা—।

কে দেশলাই জ্বালল ? কার এখানে আসার প্রয়োজন হল ? কেন ? ঘরে ইলেকট্রিক আলো থাকা সত্ত্বেও দেশলাই কেন ? কি মতলব ছিল তার ?

পুলিশ অফিসারের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। দূরে কোণে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। একটা শিশি চক্‌চক্ করছে—ভেতরে কিছু আছে মনে হচ্ছে। ওটা তো খালি নয়। মনে হচ্ছে শিশির গায়ে কোন ডাক্তারখানার নাম লেখা। একটা ছড়ি দিয়ে ইন্সপেক্টার টেনে বের করলেন শিশিটাকে। মাটি থেকে তুলে বিশেষজ্ঞের হাতে দিলেন। বিশেষজ্ঞ শিশিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তারপর ডেপুটির হাতে দিয়ে বললেন,

—কাগজের গুলি গুলো, এই শিশিটা আর ঐ তালাটা লেবোরেটারীতে পাঠিয়ে দিন—। মনে হচ্ছে শিশিতে ঘুমের ওষুধ। লক্ষ্য করেছেন কি—ওষুধের নামটা, শিশির গায়ে লাগানো কাগজটা থেকে কে যেন ব্লেড দিয়ে সযত্নে তুলে দিয়েছে। ব্যাপারটা 'মোটিভেটেড' সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বাড়ী তো, স্যার, বিয়ের পারপাজেই ভাড়া দেওয়া হয়। কত শত পার্টি ভাড়া নেয়—। কার জিনিস—কবেকার জিনিস পড়ে আছে। কে জানে ?

ডি-সির কথায় বিশেষজ্ঞ হেসে বললেন— দ্যাট্‌স্ ট্রু—। কিন্তু

এটা নিয়ে 'প্রসিড' করতে দোষ কি। বলা যায় না, হয়তো এই ঘটনার সঙ্গে শিশিটার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। যে ওষুধ ঘুম আনে, সে ওষুধ মৃত্যুও আনতে পারে। বারবিট্যুরেট্ পয়জ্নিং ইজ্ ডেন্জারাস্।

যথাসময়ে ভদ্রলোকের 'ভিসারা'—অর্থাৎ স্টম্যাক্, কিড্নি, লীভার, স্প্লীন, ইন্টেস্টাইন—সবই লেবরেটারীতে এল কাঁচের জারে সীল-করা, লেবেল-আঁটা অবস্থায়। বিষ পরীক্ষা করা হবে পরীক্ষাগারে ছুদিন পরে। ফরেন্সিক লেবরেটারীর ভিসারা সেকশন্-ইন্-চার্জ অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্ দ্রুত গতিতে তেতলায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের ঘরে এলেন। হাতে তাঁর ছোট একটা শিশি। টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়াতেই সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ্কে বললেন—বসুন। তারপর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—ইনি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ—।

রসায়নবিদ্ চেয়ারে উপবিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের দিকে চেয়ে নমস্কার করলেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে বিশেষজ্ঞের উদ্দেশ্যে সামান্য উত্তেজিত স্বরেই বললেন,

— স্যার, কেসটা খুবই কম্প্লিকেটেড্।

বিশেষজ্ঞ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,

—হ্যাট্ আই অল্সো এ্যান্টিসিপেটেড্। সেটা আমারও মনে হয়েছিল। আপনি ভিসারা পরীক্ষা করে কি পেলেন? শিশিতে পেয়েছেন ঐ একই জিনিষ তো?

মাথা নেড়ে রসায়নবিদ্ বললেন—

—না। শিশিতে স্যার, আমি বারবিট্যুরেট্ পেয়েছি। ঘুমের ওষুধ।

—হ্যাটস্ রাইট। আর—ভিসারাতে?

রসায়নবিদ্ এবার একটু চিন্তিত হলেন। ইতস্তত করে বললেন,

—কিন্তু ভিসারাতে পাচ্ছি অন্য বিষ। সম্পূর্ণ আলাদা।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও ডেপুটি কমিশনার দুজনেই বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। এক সঙ্গেই বললেন,

—এঁ্যা! অন্য বিষ? আপনি বলছেন কি?

—হ্যাঁ স্যার। বারবার পরীক্ষাতে ঐ বিষই পজিটিভ হচ্ছে।

—সে কি? ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রসায়নবিদ্ আলোচনা করার ভঙ্গিতে থেমে থেমে বলতে লাগলেন,

—হ্যাঁ। আমি শিশির ভেতরের জিনিষটা পরীক্ষা করে পেলুম ঘুমের ওষুধ, কিন্তু ভিসারাতে পাচ্ছি অন্য বিষ। পুলিশ রিপোর্টে আমরা পেয়েছি ভদ্রলোক—[যিনি মারা গেলেন তিনি]—খাবার সময়ে জল খেতে গিয়েই কলা পাতার ওপর পড়ে যান।—কারণ? হত্যাকারী তাঁকে মারার জন্য জলের সঙ্গে মিশিয়েছিল এক সাজ্ঘাতিক বিষ—ফলিডল।

রসায়নবিদ্ থামলেন।

ডেপুটি কমিশনার বললেন,

—তাহলে আপনাদের পরীক্ষাতে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ধরে নেওয়া যায় যে ভদ্রলোককে অর্থাৎ পূর্ণেন্দুবাবুকে 'ফলিডল' খাওয়ান হয়েছে।

রসায়নবিদ্ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—

—হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ নয়। ঘুমের ওষুধ ব্যবহারই করা হয়নি।

এতক্ষণ বিশেষজ্ঞ চুপ করেছিলেন। এবার বললেন—হ্যাঁ তাই। ইট্ ইজ্ এ কেস অব মার্ডার। এই যে টেবিলে দেখছেন কাগজের গুলিগুলো সাজান রয়েছে, এ গুলো সেই বিয়ে বাড়ী থেকে আনা হয়েছে। কোনটাতে পেয়েছি বিয়ের ফর্দ্দ। কোনটাতে বিয়ের খরচা পাতি লেখা। অর্থাৎ কোনটাই কাজের নয়।

একটু থেমে ডেপুটি কমিশনারের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে, সাবধানে বিশেষজ্ঞ টেবিল থেকে শিশিটা তুলে নিয়ে বললেন,—এই দোকান থেকে একটা জিনিষ আনতে হবে আপনাদের—। যেদিন এই ওষুধ

বিক্রি করা হয়েছে সেই দিনের ক্যাশমেমো বইটা 'সীজ্' করে আনুন—। শিশির গায়ে ডাক্তারখানার ঠিকানা আছে। টুকে নিন।

—কেন স্যার—? বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন ডেপুটি কমিশনার।

—দরকার আছে অফিসার। আর পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে সকলের স্টেট্‌মেণ্ট্ নিন। পরে আমাকে জানাবেন। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্ —।

—আচ্ছা স্যার।

শিশির গায়ের ঠিকানা টুকে নিয়ে নমস্কার করে দু-জনে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ক্লান্তস্বরে বললেন,—পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে পয়েজ্‌নিং বলছে। আমরাও ভিসারাতে 'ফলিডল' পেয়েছি। শিশিটাতে ঘুমের ওষুধ। এখন দেখতে হবে এই শিশির সঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুর কোন যোগ আছে কিনা। আগে ফাইন্যাল রিপোর্টটা তৈরী করে ফেলুন।

রসায়নবিদ্ ঘাড় নেড়ে বললেন— আচ্ছা স্যার। আমি আজকে বিকেলের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে নেমে এসে রসায়নবিদ্ তাঁর নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ডেপুটি কমিশনার অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টারকে পাঠালেন পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ি। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত ইন্সপেক্টর সকালের দিকে একাই এলেন। দরজার কড়া নাড়তেই দিব্যেন্দু দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ইন্সপেক্টারকে দেখে বিনীত কণ্ঠে বলল,—আসুন—ভেতরে বসুন।

ইন্সপেক্টার ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। দিব্যেন্দু দাঁড়িয়ে রইল। এ কদিনেই দিব্যেন্দুর মুখ চোখের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। গলার স্বর জড়ানো। বেশ বোঝা যায়, গভীর শোকের ছায়ায় বাড়িটা

থম্‌থম্ করছে। বাড়ির বড় ছেলের মৃত্যু। হোক্ না সে অন্ধ, সংসারের গলগ্রহ।

ইন্সপেক্টার মৃদু হেসে বললেন,—অত চিন্তা করবেন না দিব্যেন্দু বাবু। যা হবার হয়েছে। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কে আসল অপরাধী।

দিব্যেন্দু চম্‌কে উঠে বলল—অপরাধী? তার মানে?

—আপনার দাদার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি।

—এঁ্যা! সারা শরীরটা কেঁপে উঠল দিব্যেন্দুর।

ইন্সপেক্টার সহজভাবে বললেন—হ্যাঁ—তাঁকে হত্যা করা হয়। জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—সে কি!

হঠাৎ যেন তার ওপর বজ্রপাত হয়েছে এই রকম ভঙ্গিতে দিব্যেন্দু আঁতকে উঠল। সান্ত্বনার স্বরে ইন্সপেক্টার মৃদু হেসে বললেন,

—কাকে সন্দেহ হয়—? আত্মীয় স্বজন? প্রতিবেশী? বন্ধু বান্ধব?

দিব্যেন্দু কান্না জড়ান স্বরে বলল—বলতে পারি না। জানি না আমি।

—চলুন আপনার বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি। এখন কোথায় তিনি? সুস্থ তো?

দিব্যেন্দু নিঃশব্দে ইন্সপেক্টারকে নিয়ে তার বৌদির ঘরের দরজার কাছে এল। ইন্সপেক্টার বললেন,

—আপনি যান, বলুন আমার কথা। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

দিব্যেন্দু ভেতরে গেল ও কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফিরে এসে বলল,

—আসুন—। বৌদি অসুস্থ। ঘুমোচ্ছিলেন।

ইন্সপেক্টার ভেতরে এলেন। শান্তভাবে নমস্কার করে বললেন,

—একটু বিরক্ত করতে এলুম। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করলেন শোয়া অবস্থায় সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অর্থাৎ সে কাঁদছে। দিব্যেন্দুর সাহায্যে কোন রকম খাটের ওপর উঠে বসল।

ইন্সপেক্টার অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে সংযত ভঙ্গিতে আবার বললেন,

—শুধু একটা কথাই জানতে চাই—কেউ শত্রু আছে কি আপনাদের?

এবারও কোন উত্তর নেই। শুধু কান্নার চাপা স্বর শোনা গেল। আর জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। জবাব দেবার মতো মনের অবস্থা হয়তো নেই ভদ্রমহিলার।

ইন্সপেক্টার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ফিরলেন। কিন্তু হঠাৎ এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখ দেখেই বোঝা গেল তিনি অপ্রকৃতিস্থ। তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও যা, না করাও তাই। ইন্সপেক্টার স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন। চোখে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো বন্ধ।

দিব্যেন্দু চাপা স্বরে বলল—ইনি বাবা—। মাথার ঠিক নেই। চলুন বাইরে যাই। উনি এখুনি আবোল তাবোল যা তা বকবেন।—চলুন।

বৃদ্ধ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন—ঐ-ঐ দিবু ওকে অ্যারেস্ট্ করো তোমরা। ওটা কি এখনো ছাড়া আছে? ঐ, ঐ খুন করেছে। আমাকেও করবে। আর ঐ বৌমা—, সী ইজ্ এ মার্ডারেস্। এক্ষুনি তোমরা ফরেন্সিক এক্সপার্ট ডাকো, তারা ঠিক ধরবে এদের।

নিতান্তই উন্মাদের প্রলাপ।

ছেলে—বৌ খুনী?

ম্লান হেসে ইন্সপেক্টার পাশের ঘরে এলেন। দিব্যেন্দু বাবাকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল।

ইন্সপেক্টার বললেন—যাঁরা যাঁরা নেমন্তন্ন বাড়িতে ছিলেন সেই

সব আত্মীয়দের বাড়ির বা আপিসের ঠিকানা লিখে দিন। সব ঠিকানা মনে আছে তো?

দিব্যেন্দু একটা খাতা বের করে ইন্সপেক্টারের সামনে ধরল। বলল,

—বিয়ের ব্যাপারে সকলের ঠিকানা যোগাড় করা হয়েছিল। এই খাতায় সব লেখা আছে।

ইন্সপেক্টার সকলের নাম, ঠিকানা ও কার কী রকম সম্বন্ধ সবই টুকে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা নাম লিখে দিব্যেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন—

—এই সমরেশ হাজরা, ইনি কে? আত্মীয়?

—না—আমরা তো ব্রাহ্মণ। সমরেশবাবু বৌদির আপিসে কাজ করেন।

—তাঁর ঠিকানা? সেটা তো লেখা নেই।—

—না—। বৌদি বলেছেন, তিনিই নেমন্তন্নের চিঠি লিখে দেবেন। তাই খাতায় লেখা হয়নি।—

—আপনার বৌদি তাঁর আপিসের কতজনকে নেমন্তন্ন করেছিলেন?

—ঐ একজনকেই। বেশী লোক নেমন্তন্ন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই বন্ধুবান্ধবদের আমরা বিশেষ বলতে পারিনি। আমার বন্ধু তিন জন, বৌদির এক জন। আর বোনের ত্রিশ জন।

—বাকী সব আত্মীয় আর পাড়া প্রতিবেশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সমরেশবাবু কি এসেছিলেন সেদিন? বিয়ের দিন রাত্রে?

—ঠিক জানি না। সমরেশবাবুকে আমি চিনি না। শুনেছি উনি বৌদির আপিসের লোক—বৌদির সেক্‌সনের বড়বাবু।

—কত বয়স? কখনো এ বাড়িতে এসেছেন—?

—ঠিক বলতে পারছি না। আমার আপিস আলাদা। আমার সরকারী আপিস। বৌদির প্রাইভেট ফার্ম। ডাল্‌হৌসী স্কোয়ার।

—দাদার মৃত্যুর পর আপনার বৌদি কবে জয়েন করেছেন আপিসে ? আপনিই বা কতদিন ছুটিতে থাকবেন ?

—আমি ? কালই একবার যাবো—। আমার ছুটি পাওনা নেই। তাই কালই জয়েন করতে হবে।

—আপনার বৌদি কবে আফিসে যাবেন—? এরপর আর চাকরী করবেন কি ?

—সেটা বলতে পারছি না—তবে—।

—তবে—কি ?

—অভাবের সংসার। দুজনের আয়েই তো সংসার চলে। তাই ভাবছি—বৌদি যদি আর চাকরী না করে তো সংসার চালানো মুস্কিল হবে। বৌদিকে বলব ভেবেছি—। অথচ—এই অবস্থায়—কি বলব ঠিক করতে পারছি না।

কান্নার বেগ সামলাতে দিব্যেন্দু বাঁ হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরল। ইন্সপেক্টার সান্ত্বনার সুরে বললেন,

—অতটা বিচলিত হবেন না—সংসারে সবই ঘটে।—আর সবই সহ্য করে নিতে হয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিব্যেন্দুবাবু—আচ্ছা, পুর্ণেন্দুবাবুর 'পলিসি' আছে-?

—ইন্সিওরেন্স পলিশি ?

—হ্যাঁ—কত ?

দিব্যেন্দু সামান্য চিন্তা করে বলল,—আছে। পঁচিশ হাজার টাকা।

—প্রিমিয়াম কি তাঁর স্ত্রীই দেন—?

ইন্সপেক্টার কলমটা পকেটে রাখলেন।

দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে বলল,

—না—আমরা দুজনেই ভাগাভাগি করে প্রিমিয়ামটা দিয়ে যাচ্ছি। দাদা টাইফয়েডে চোখ হারাবার পর তার চাকরী গেল। সুতরাং পলিসিটা চালান হচ্ছে। নমিনি তাঁর স্ত্রীকেই করা আছে।

—ও—।

ইন্সপেক্টার ছোট্ট নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন। দিব্যেন্দুও সঙ্গে সঙ্গে এল। জীপে উঠে বসে ইন্সপেক্টার কলমটা পকেট থেকে খুলে নিয়ে হাতের কাগজের ওপর ধরে বললেন,

—আপনাদের আপিসের নাম, ঠিকানা বলুন তো—যদি দরকার পড়ে তো যাতে সহজেই যোগাযোগ করতে পারি।

দিব্যেন্দু ঠিকানা ছুটো ইন্সপেক্টরকে বলল।

ইন্সপেক্টর লিখে নিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলল

নানা চিন্তার ঘায়ে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত। কে এই সমরেশ হাজরা? কেমন লোক সে?

ইন্সপেক্টার পূর্ণেন্দুবাবুর আত্মীয়দের সবাইকে খুব মর্মাহত দেখলেন। হঠাৎ খেতে বসে মৃত্যু, সকলকে বড়ই বেদনা দিয়েছে। কেউ কেউ বললেন—নিয়তি। থ্রম্বোসিস্ অ্যাটাক্। কেউ বললেন—ভালই হয়েছে। তিলে তিলে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এই ভাল। ইন্সপেক্টার বললেন,—স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তো ভালই হত। কিন্তু এ যে হত্যা।—

—পূর্ণেন্দুবাবুকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। মার্ডার কেস, মশাই।

আত্মীয়রা সবাই হতবাক্ হলেন। সবাই ভীত, আতঙ্কিত। এবার ইন্সপেক্টর এলেন পূর্ণেন্দুবাবুর ছোট শালী শর্মিলার বাড়ি।

শর্মিলার চাল চলন আচরণে উগ্র আধুনিকতার ছাপ থাকলেও কথাবার্তা খুবই সংযত, স্পষ্ট। এক সময় ইন্সপেক্টার জিজ্ঞাসা করলেন,

—আচ্ছা শর্মিলা দেবী, সেদিন ঐ বিয়ে বাড়ীতে কোন ঘরে বা খাওয়ার জায়গায়—ছাদে এমন কোন ঘটনা কি ঘটেনি যা মনে রাখার মত?

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে শর্মিলা চোখ বুজিয়ে কী যেন চিন্তা করে নিল। পরে নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে ডান হাতের চেটোটা বেঁকিয়ে বলল,

—অফিসার, ঐ বিয়েবাড়ীর হৈ হুল্লোড়ে আলাদা করে কোন ঘটনা বলব বলুন। রাণুদি বা মেজদির ছুটোছুটি, আনন্দ, হাসি এটুকুই ভাল লাগছিল। ও তো জীবনে হ্যাপি হতে পারল না।

—কেন? ইন্সপেক্টার না জানার ভাণ করলেন।

—বা রে, জামাইবাবু তো বিয়ের পরের বছরই টাইফয়েডে ব্লাইণ্ড্ হয়ে যান। মেজদির সাধ আহ্লাদ সবই তো গেল। তাই ওকে খুসি দেখলে আনন্দ পাই। সেদিন ও—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন—।

আসল কথাটার যদি সূত্র পাওয়া যায়। ইন্সপেক্টার উৎসাহী হলেন।

শর্মিলা বলল,—মেজদি হঠাৎ সেদিন রাতে শেষ দিকে পরিবেশন করতে আরম্ভ করল। বালতি হাতে ছুটোছুটী। দিবেন্দুদা—দিদির দেওর খুব ভালো। দিব্যেন্দুদা যা বলেন মেজদি তাই করে। মেজদিও দিব্যেন্দুদা ছাড়া কিছু করে না— কোথাও যায় না। দিব্যেন্দুদার জন্যেই তো মেজদি যাহোক বেঁচে আছে। তা না হলে কবে আত্মহত্যা করত। দিব্যেন্দুদা শিল্পী— তাঁর অনুভূতি বড্ড সূক্ষ্ম। তিনি ছবি আঁকেন।

অপ্রাসঙ্গিক কথায় মনে মনে বিরক্ত হলেন ইন্সপেক্টর। বললেন, —পরিবেশন করার সময় কিছু ঘটনা ঘটেনি? বা অন্য কোন সময়ে? অন্য কোথাও?

—কত ঘটনাই তো ঘটেছিল। মেজদি মাংসের বালতিশুদ্ধ ছাদে পড়ে গেল একবার। সবার কি হাসি। অভ্যেস নেই তো অত ছুটোছুটির। একবার তো জল ভরা গেলাস আনতে গিয়ে সুমিদির গায়ের ওপর গেলাস-শুদ্ধ পড়ে গেল। ওর হালকা সবুজ

রঙের বেনারসী শাড়িটাই গেল ভিজে। এই সব কত কি ঘটনা ঘটেছে। সুমিদি, মানে আমাদের বড়দি।

—আরও দুটো খবর চাই—। হাসতে হাসতে বললেন ইন্সপেক্টর।

—বলুন—।

—সুমিদির বাড়ীর ঠিকানাটা, আর—মনে করতে পারেন কি, যে ব্যাচে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ আপনার মেজদি পরিবেশন করেছিলেন সে ব্যাচে পূর্ণেন্দুবাবু কি খেতে বসেছিলেন ?

—হ্যাঁ জামাইবাবু আমাদের সঙ্গেই বসেছিলেন—ঐ একই ব্যাচে।

—ধন্যবাদ। এটা জেনে রাখুন আপনার জামাইবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—।

—অসম্ভব। তবে কি···।

—হ্যাঁ—ঠিক তাই শর্মিলা দেবী, আপনার অনুমান সত্য। মার্ডার।

দু-হাতে মুখ ঢেকে বজ্রাহতের মতো বসে পড়ল শর্মিলা। সেদিন রাত্রে ইন্সপেক্টর অতর্কিতে এলেন বড়দির বাড়ি। শেষ পর্যন্ত বড়দিকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দিয়ে ইন্সপেক্টর প্রথমেই সেই বেনারসী শাড়িটাই সীজ্ করলেন। বড়দিও শুনলেন পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যু হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে—বিষ প্রয়োগে।

—একটা অনুরোধ রাখবেন ? কান্না-ভেজা গলা বড়দির। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাচ্ছেন তিনি।

ইন্সপেক্টার শান্তস্বরে বললেন,

—বলুন—।

—ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে জিনিসপত্তর কেটে কুটে পরীক্ষা হয় জানি। কিন্তু এ শাড়িটা যাতে কাটা বা নষ্ট না হয় তার চেষ্টা করবেন, এই অনুরোধ।

—কেন ? এ ধরণের অনুরোধ করছেন কেন ?

—রাসু সেই বিয়ের দিন রাত্রে এই শাড়িটার প্রশংসা করেছিল,

মানে, উপহার চেয়েছিল। তাই ভাবছি এটা ওকে দেব। জীবনে যদিও সে আর এটা পরবে না।

—কখন চেয়েছিল বলতে পারেন? অদ্ভুত কথা তো। সবই অদ্ভুত।

—অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি, তখন। ও তো কখনও কিছু মুখ ফুটে চায় না। এটাই ওর স্বভাব। বড্ড জেদি। আহা বেচারা।—

—বেশ আপনার অনুরোধ যথাস্থানে জানাব। বললেন ইন্সপেক্টার।

ইন্সপেক্টারের প্রশ্নে শাড়িটার কোথায় জল পড়েছিল দেখালেন বড়দি।

ইন্সপেক্টার কালি দিয়ে একটা মার্ক করে রাখলেন।

ফরেন্সিক সায়েন্স লেবোরেটারীর মেডিকো-লীগ্যাল সেক্সনের পরীক্ষা কক্ষ। টগবগ করে ফুটছে জল আর কয়েক টুকরো ফিল্‌টার পেপার—দামী বিলিতি কাগজ। সামান্য অ্যাসিড্‌ মেশানো আছে জলে। ষ্টীম ডিষ্টিলেসন চলছে—বিরাট ষ্টীম চেম্বারে। এরপর ডিষ্টিলেট্‌টা রাখা হল কিছুক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয়—রুম্‌-টেম্পারেচারে।

তারপর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এক্সট্রাক্‌শন করা হল। নানা জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে নানা রি-এজেন্টের সাহায্যে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে সতর্ক দৃষ্টিতে একাগ্রতা আর অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে পরীক্ষা এগিয়ে চলল।

পরীক্ষার ফল মিলল—বেনারসী শাড়ির জল পড়া জায়গাগুলোতে "ফলিডল"—পোকামাকড় মারা বিষ পাওয়া গেল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সমস্ত ঘটনাটা পুনর্বার পর্য্যালোচনা করলেন।

বাকী আছে শুধু একটি পরীক্ষা—ক্যাশমেমোর পাতাটা। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার রানু দেবীর অফিস থেকে লেখা পুরোনো ফাইল-পত্তর সংগ্রহ করে ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে পাঠালেন; অত্যন্ত গোপনে।

এদিকে দিব্যেন্দুর আপিসেও হানা দেওয়া হল ঐ একই কারণে। উদ্দেশ্য—হাতের লেখা পরীক্ষা।

কিন্তু না—মিলল না।—উভয়ের হাতের লেখা ভিন্ন।—ক্যাশমেমোর লেখার সঙ্গে মিল নেই। তাহলে কে কিনেছিল ঘুমের ওষুধ?—তারিখ তো বিয়ের দু-দিন আগেকার। অন্য আর কে গোপনে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? অথচ পূর্ণেন্দুবাবুর বোনের বিয়ের আগে এক মাস কেউ ঐ বাড়ী ভাড়া নেননি। বাড়ীওয়ালা এ কথা পুলিশকে জানান। কোন আত্মীয় অথবা কোন সন্দেহভাজন প্রতিবেশীর হাতের লেখার সঙ্গেও ক্যাশমেমোর লেখাটা মিলল না। ইন্সপেক্টার আরো জোর তদন্ত চালানোর নির্দ্দেশ পেলেন।

এক মাস কেটে গেল। ইন্সপেক্টার আর কিছু নতুন সূত্র যোগাড় করতে পারলেন না। ফরেন্সিক লেবরেটারীর উক্তি, এ বিষয়ে করণীয় আর কিছু নেই।

পরীক্ষা হয়ে গেছে। রিপোর্ট চলে গেছে। তবুও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটার শেষটুকু জানার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব। তিনি সম্ভাব্য নানা পথের কথা চিন্তা করেন। কী ভাবে খুনীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সে বিষয় নিয়ে লেবরেটারীতে রসায়নবিদ্ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডেপুটি কমিশনারও মাঝে মাঝে লেবরেটারীতে উপস্থিত থাকেন।

এক সময় বিশেষজ্ঞ বললেন,

—ইন্সিওরেন্সের টাকাটা পাবে স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রীর আচরণটা কিছু জেনেছেন, অফিসার? আই মীন্ কন্‌ডাক্ট—চরিত্র।

ডেপুটি কমিশনার হেসে বললেন,

—ইনি যে চাকরী-করা মহিলা, স্যার। সব সময়েই প্রায় বাড়ীর বাইরে। তবে স্যার, রানু দেবীর চরিত্র সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনিনি। ভদ্রমহিলা খুবই আপ্-টু-ডেট্। হতেই হবে, চাকরী করে খেতে হয় তো। আপনি কি ঐ লাইটে ভাবছেন, স্যার? তাহলে বলি অফিস কোলিগ তো রয়েছে,—ছেলেদের সঙ্গে মেশে ঠিকই।

—হ্যাঁ— তাই ভাবছি। এক দিকে অন্ধ স্বামী—পঙ্গু। যুবতী স্ত্রী, —আপিসে চাকরী করে, রোজগার করে। পলিসির টাকা— সেই পাবে।—

—এ কী বলছেন, স্যার! আপনি কি স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন?

—কেন—অসম্ভব কিছু কি? এ দিকটাও তো ভাবা উচিত। যাক্‌গে, এখনই মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে এটুকু যেন আপনার চিন্তার বাইরে না যায়।

—আচ্ছা স্যার, স্ত্রীকেও ওয়াচ্ করার জন্যে নির্দ্দেশ দিচ্ছি।

—মানুষের মন স্বভাবতই পাপের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই আমরা প্রথমেই চিন্তা করি কোন্ কো'্ সুড়ঙ্গ পথে পাপ মানুষের মনে সহজে ঢুকতে পারবে।··· স্বামী অন্ধ অর্থাৎ —ইনভ্যালিড্। সংসারে বাড়ন্ত—কাজেই স্বামী বোঝা। গলগ্রহ। স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, চাকরী করে। স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী পাবে পঁচিশ হাজার টাকা। তারপর? আর পাবে—মুক্ত জীবন। কিন্তু ফাঁক থাকছে—কে সে? কার সঙ্গে রানু দেবী মুক্ত জীবন চালাবে? —ফাইণ্ড্ আউট্ দ্যাট্ মিসিং লিঙ্ক। সেইটুকুই খুঁজতে হবে অফিসার। একটু থামলেন বিশেষজ্ঞ, বললেন,

—সে-ই কিনেছে বারবিট্যুরেট্ বিষ, সে-ই মিশিয়েছে ফলিডল।— সে-ই চায় রানু দেবীকে তার জীবনে। কে সে—? খুঁজে বের করতে হবে।

বিশেষজ্ঞ থামলেন। নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দৃঢ় কথাগুলো ঘরময় ঘুরপাক খেতেই লাগল।

একই কথা সবাই ভাবতে লাগলেন,—হোয়্যার ইজ্ দ্যাট্ মিসিং লিঙ্ক। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ব্রেক্ কষে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই এদিক ওদিক চেয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল রানু, সঙ্গে সমরেশ হাজরা। জায়গাটা আপিস থেকে বেশ খানিকটা দূরে— একটা বাঁকের মুখে। ছুটির পর ফিরছে দু-জনে।

ট্যাক্সি ছুটল দক্ষিণে।

—এই পথটুকু আসতেই কেমন যেন হাঁপিয়ে গেছি সমরেশ—

—কেন বলো তো?

—একটু হাঁটলেই কেমন যেন হাঁফ ধরে। মনে হয় পড়ে যাবো।

—মনটা ক্লান্ত কিনা তাই। টনিকটা খাচ্ছো তো? চিন্তা কম করো।

—কি যে হয়ে গেল। সবই স্বপ্ন মনে হয় মাঝে মাঝে।

—কালপ্রিট:কে পুলিশ ধরেছে—? না হাত গুটিয়ে বসে আছে।

—জানি না। কি হবে ঝামেলা করে? তার আত্মার শান্তি হোক।

—পলিসির টাকাগুলোর জন্যে লিখে দাও—ওসব পেতে দেরি লাগে।

—কি হবে ও অভিশপ্ত টাকায়—? আমি ে·ব না—চুলোয় যাক।

হঠাৎ হো হো হেসে উঠল সমরেশ। হাত পেতে বলল,

—তুমি না নাও, আমায় নয় দিয়ে দিও—বড় অভাবের সংসার, সত্যি বলছি রানু, অন্ততঃ ধার দিও। আমিই লিখে আদায় করে দেব। কাগজ পত্তর এনো কাল আপিসে।

রান্নু চুপ করে রইল। গাড়িটা তখন প্যারেড গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সমরেশ বলল,

—নামবে নাকি? এর মধ্যে বাড়ি গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে একটু বেড়ান ভাল। বাড়িতে শুধু আবোল তাবোল চিন্তা করবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে—

স্মিত হেসে রান্নুর মুখের দিকে চাইল সমরেশ।

—না—। লোকে কি বলবে? এ অবস্থায়ও চাকরী করি তাই কত লজ্জা হয়। কিন্তু সেটা অন্ন—, না করলে চাকরী যাবে—তাই করি। উপায় নেই।

—এ সব তোমার উইক্ সেন্টিমেণ্টের কথা। স্বামী মারা যাবার পর সব স্ত্রী কি চাকরী ছেড়ে দেয়? না—আমোদ আহ্লাদ ভুলে যায়। আর তা ছাড়া তোমার কথা তো আলাদা। স্বামীর কতটুকু তুমি পেয়েছ রান্নু?

—তাঁর তো অপরাধ নয়, সমরেশ—। রোগে সে চোখ হারিয়েছিল। তাতেই মাথাও গোলমাল হয়ে গেল। সবই ভাগ্য। ভেবেছিলুম চাকরী ছেড়ে দেব বিয়ের পর। হল না। উল্টে চাকরী এখন না করলেই নয়। ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে।

রান্নু দীর্ঘশ্বাস ফেলল সঙ্কোচের সঙ্গে।

সমরেশ বলল,

—একটা কথা বলবো? সহজ ভাবে নিও। ভেবে দেখো কথাটা।

—বলো—। নিরুত্তাপ শান্ত স্বর রান্নুর—কান্না ভেজা গলায়।

—তুমি আবার বিয়ে করো রান্নু—তোমার সবই আছে।

ড্রাইভারের সামনের ছোট আরশিতে রান্নুর মুখ দেখা যাচ্ছে। বাইরে ঘন সবুজ মাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। দূরে পশ্চিম আকাশে টকটকে লাল রঙ। কেমন যেন উদাস হয়েছে রান্নু। হয়ত কিছুটা চঞ্চল। সমরেশের কথায় প্রতিবাদ করেনি রান্নু। আবার কথাগুলো মেনে নিতেও বাধছে কোথায়। হয়ত ভয় পাচ্ছে।

গাড়ি সারকুলার রোড পেরিয়ে এলগিন রোড হয়ে বাঁ দিকে চলল—সমরেশের নির্দ্দেশ মত। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামল একটা বাড়ির সামনে। সমরেশ গাড়ির দরজাটা খুলে সহাস্যে বলল,

—চল, আমার বাড়ী হয়ে যাবে। নেমে চা খেয়ে যাবে।

—না—থাক। বাড়ি যাই। তুমি নেমে যাও। আমি চলে যাই।

—না—না। নামো তো—। এত ভয় পাচ্ছো কেন? পুলিশ কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে নাকি? আমি তো রয়েছি। তোমার ভয় কি? চলো।

সামান্য বিবর্ণ হয়ে রান্নুর মুখটা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। দুজনে নামল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল সমরেশ। তবুও ট্যাক্সির ড্রাইভার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত খদ্দেরের আশায় কিংবা হয়ত অন্য কিছুর অনুসন্ধানে।

ওরা বাড়িতে ঢুকতেই নীচু হয়ে বাড়ির নম্বর দেখে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

কয়েকদিন পর।

সেই ড্রাইভার—সেই ট্যাক্সি—। আরোহী—রান্নু আর দিব্যেন্দু। তারা ফিরছে আপিস থেকে। দিব্যেন্দু রান্নুর মুখের দিকে চেয়ে সামান্য রাগত স্বরে বলল,

—বাবা পুলিশকে কি বলছে জান? কী ড্রেড্‌ফুল টক্‌!

—এঁ্যা—কি! চমকে উঠে রান্নু দিব্যেন্দুর দিকে মুখ ফেরাল!

—তুমি-ই জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছো—।

হালকা হাসল দিব্যেন্দু।

—এঁ্যা! সে কি! আমি তো কিছুই জানি না।—এখানে বিষ কোথা থেকে কেমন করে এল?

—বাবার কথা ছেড়ে দাও। পাগলের কথা কেউ শুনবে না—। বাবা মিছিমিছি গোলমাল করছে। পুলিশকে ওসব বলার মানে তো তোমার ক্ষতি করা। বাবা বুঝছে না। পাগল হলে যা হয়।

কোন কথা না বলে রান্নু দু-চোখ বুজে পেছনের সীটে হেলান দিয়ে রইল। দিব্যেন্দু হঠাৎ কি ভেবে বলল,

—ভাল কথা, আমার সেই ছবিটা সেকেণ্ড হয়েছে কম্পিটিশানে। —এবার পাঁচশো টাকা পাবো। অথচ কি জান এই ছবিটার ওপর বিশেষ মন দিইনি। কোন্ ছবিটা বুঝতে পারছ? আরে— চোখ খুলে শোন না।

দিব্যেন্দু আলতো করে ঠেলে দিল রান্নুকে।

—কোন্ ছবিটা জানো?

সামান্য ধাক্কা খেয়ে চমকে রান্নু চোখ খুলে - নিঃশব্দে ছোট্ট করে ম্লান হেসে বলল—

—জানি। থামো -। ও ছবি যেন বাড়িতে এনো না।

—কোন্‌টা বল তো? বললে তো জানি, কোনটা বলতো?

এবার রান্নু লজ্জায় লাল হল। চাপা স্বরে বলল,

—গাড়ী থেকে নেমে বলব? ওটা জানবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?

-না—বল। আরে ড্রাইভার তো পাঞ্জাবী, বাংলা বোঝে না।

রান্নু একটু হেসে বলল,

—আমাকে জোর করে মডেল করে যে ছবি তুমি অনেক রাত ধরে আঁকলে, সেই ছবিটা—। সেদিন রাত্তিরে তুমি আরও কি যা তা সব করেছিলে—

আরো অনেক কথা বলতে গিয়েও রান্নু থামল।

দিব্যেন্দু উৎসাহিত হয়ে বলল,

—অপূর্ব ছবি হয়েছে। যেন জীবন্ত! রান্নু, তুমি সত্যি কত সুন্দর। শিল্পী কত আদরের, কত লোভনীয় নিজে তা জানলে না—। কেন বল তো?—বল না—এই।

দিব্যেন্দু রান্নুর পাশে সামান্য সরে আসার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোর সঙ্কেতের সামনে গাড়ি ঘচাং করে দাঁড়াল।

দিব্যেন্দু নিজেকে সামলাতে না পেরে রান্নুর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। রান্নু ঠোঁট টিপে হেসে বলল,

—আঃ—কি যা তা করছ। বস না ভাল করে। ওঠ। এ রাস্তাটা নির্জন তাই, তা না হলে লোকে ঢিল মারত। সোজা হয়ে উঠে বস।

কিন্তু দিব্যেন্দু রান্নুর কোল থেকে উঠেই বলল,

—কেসটা মিটে গেলে রান্নু আমরা দুজনে চলে যাব। কেমন? আসলে দাদা মারা গেছেন ফুড পয়েজনিং হয়ে। বিষ-টিস মিথ্যে কথা. কোন প্রমাণ নেই।

—পুলিশ কি বলেছে তোমার দাদাকে কেউ বিষ খাইয়েছে? কিন্তু এ সন্দেহের অর্থ?

—জানি না। সকলে মিথ্যে কথা রটাচ্ছে।

—বড়দি কাল কি যেন বলতে গিয়েও বলল না।

দিব্যেন্দু তাচ্ছিল্য সহকারে হাত নেড়ে বলল,

—ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আবোল তাবোল কী যেন রিপোর্ট দিয়েছে – ওসব কোর্টে প্রমাণ হবে না। হলে এতদিন হয়ে যেত। পুলিশ ছাড়ত?

রান্নু হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কি যেন এক আতঙ্কে তার মাথাটা ঘুরে গেল।

গাড়িটা ঠিক সেই সময়েই ডান দিকে বাঁক নিল বলেই, দিব্যেন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। কিন্তু ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়াল না কারণ তার সামনেই যে আয়না লাগানো। আকারে বেশ বড়।

আর তাছাড়া—রান্নু. দিব্যেন্দু আর সমরেশকে দেখার জন্যেই যে তার পাঞ্জাবী ড্রাইভারের রূপ নেওয়া। ঠিক সময়ে রান্নুর অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো।···তাকে গাড়িতে তোলা, দিব্যেন্দুকে ছায়ার মত দিন রাত অনুসরণ করে ফেরা····সমরেশকে চোখে চোখে রাখা, সবই তো তার কাজ—।

বলা বাহুল্য, পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছদ্মবেশী পুলিশ ইন্সপেক্টর ছাড়া আর কেউ নন।

সেদিনই কয়েক ঘণ্টা পরেই ইন্সপেক্টর এলেন পূর্ণেন্দুবাবুদের বাড়ি। রাত অনেক হবে। প্রায় দশটা। বাইরের ঘরটায় আলো জ্বলছে। দরজাটা সামান্য ঠেলতেই বিশ্রী আওয়াজ করে খুলে গেল। ভেতর থেকে কে যেন বলল—

—বাবুর এই আসা হল—রাত কত খেয়াল আছে?

দীর্ঘদেহী ইন্সপেক্টার বাইরে থেকে দেখলেন ঘরের ভেতরে খাটের ওপর দরজার দিকে পেছন করে বসে কী যেন পড়ছে রান্থ—। ইন্সপেক্টর একটু এগিয়ে এলেন ঘরের দিকে।

রান্থ পেছন না ফিরেই বলল—

—তোমার ছবিগুলো দেখছি—। নাঃ ভালই হয়েছে। এগুলো সব আমার কাছে থাক্।

ইন্সপেক্টর এবার মৃদু হেসে বললেন,

—ছবিটা আমায় শুধু একবার দেখাবেন রান্থ দেবী। রান্থ ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল। ছিটকে খাট ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়াল।

ইন্সপেক্টার সহাস্যে বললেন—

—ভয় নেই রান্থ দেবী—আমি। এত চমকে উঠলেন কেন? আজ হঠাৎ একটু প্রয়োজনে এলুম। এগুলো কার আঁকা ছবি?

ইন্সপেক্টার ছবিগুলো তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন।

—দিব্যেন্দু এঁকেছে। ওর আঁকা ছবি প্রাইজ পায় কম্পিটিশানে।

—দিব্যেন্দুবাবু এত ভাল আঁকতে পারেন?

—হাতের লেখাও সুন্দর। দু'হাতেই লিখতে পারে।

—উনি আবার দু-হাতেই লিখতে পারেন? বাঃ। রীতিমত গুণী লোক।

—হ্যাঁ। বসুন না—। ও এসে পড়বে, টিউশানিতে গেছে।

—না—আমি অন্য দিন আসব। এই ছবিগুলো নিয়ে যাই, কেমন?

—কী জন্যে এসেছিলেন বললেন না তো ?

—কিছু না—এমনি। দিব্যেন্দুবাবুকে বলবেন, ছবিগুলো দেখা হলে ফেরৎ দিয়ে যাবো। বেশ ভাল লোক উনি—তাই না ? সরল সহজ—। —এবার রান্নু সলজ্জে বলল,

—হ্যাঁ—মনটা খুব সরল···ছেলেমানুষের মত।

ইন্সপেক্টার হালকা রসিকতা করার ভঙ্গিতে বলে বসলেন—

—আপনার ছোট বোন শর্মিলা বলেছিলেন—বলবো ?

—কি—? কৌতূহলে যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল রান্নু—

—দিব্যেন্দুবাবু না থাকলে আপনি এতদিন আত্মহত্যা করে বসতেন।

কথাটা শুনে রান্নু মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে রইল।

ইন্সপেক্টার সহাস্যে কথাটা বলে ঘরের বাইরে চলে এলেন। আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—চলি। দরজাটা বন্ধ করে দিন।—

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন ইন্সপেক্টর।

অনেক রাত। রাস্তা প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে গাড়ি চলছে। ইন্সপেক্টর চিন্তামগ্ন। মামলাটার নানা টুকরো টুকরো অংশ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। কোথায় এর সূত্র ?····

সব কিছুই মনে হচ্ছে এদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রান্নু, দিব্যেন্দু আর সমরেশ। সবাই চাইছে এমন কিছু যা সমাজের চোখে আনে ঘৃণা। —মানুষের নীতিবোধকে করে পঙ্গু।

নানা ধরণের তদন্ত চালানোর ফলেই পুলিশ অফিসারের মন দৃঢ়, প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। শর্মিলার সেদিনের হালকা উক্তি অফিসারের মনে হতাশার তমিস্রায় বিদ্যুৎ চমকের কাজ করল।

—দিব্যেন্দুদা শিল্পী—তিনি ছবি আঁকেন। দিব্যেন্দুদা যা বলেন মেজদি তাই শোনে, তাই করে। তা না হলে মেজদি আত্মহত্যা করত—

শর্মিলার ষ্টেটমেন্টের এই কথাগুলো মিথ্যে নয়। রানুও স্বীকার করল।

—কিন্তু এ কি সম্ভব— ?

ভাবলেন ইন্সপেক্টর।

জগতে সবই সম্ভব। মানুষের মন বড্ড জটিল। মানুষ অনেক সময় এমন জিনিষ চায় যার ফলে সমাজ সংসার কলুষিত হয়। তবু সেই অবুঝ মনের কাছে মানুষের অসহায়তা। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা সব কিছু তখন খড়কুটোর মত স্রোতে ভেসে যায়। একটা নির্বোধ আবেগে মানুষ চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ করে বসে।

একদিকে অন্ধ স্বামী, অপরদিকে সুস্থ সবল যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি দিব্যেন্দু—সে অবিবাহিত। ঐ সঙ্গে স্বামীর বীমা কোম্পানির পঁচিশ হাজার টাকা।

এক দিকে জমাট কালো অন্ধ গুহায় আবদ্ধ জীবন, অপর দিকে আলোকোদ্ভাসিত স্বাধীন নারীত্বের চরম বিকাশের মুক্তি পথ্।

মনের মধ্যে একবার পাপ ঢুকলে, তার শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তাই তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। দিব্যেন্দুও পেল না।

শেষ পর্যন্ত দিব্যেন্দুকেই গ্রেপ্তার করা হল। পূর্ণেন্দুবাবুকে বিষ-দানে হত্যার অপরাধে কোর্টের অনুমতি নিয়ে তাকে থানায় আনা হল।

সে নির্বাক। তার ঘর তল্লাসী করে কয়েকখানা ছবি আঁকার মতো খাতা পাওয়া গিয়েছিল। আঁকার খাতার মধ্যে অনেক লেখার সঙ্গে ক্যাশমেমোর লেখাটার মিল পাওয়া গেল। সেগুলোর সব দিব্যেন্দুর বাঁ-হাতের লেখা।

ওষুধের দোকানে দিব্যেন্দু ডান হাতের বদলে বাঁ হাত দিয়ে লিখেছিল। এ কথা রান্নু দেবী স্বীকার করলেন।

বিষপ্রয়োগে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে শুনে কাঁপতে কাঁপতে বিকট চিৎকার করে বিছানার ওপর পড়ে গেলেন রান্নু দেবী। হঠাৎ বিকারের ঘোরে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন,

—না-না—এ চাইনি—এ আমি চাইনি—। কখনো না, কখনো না। দিব্যেন্দু তুমি ওকে খুন করলে কেন?

চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে আবার বলল রান্নু,

—কেন দ্বিতীয়বার জলের গ্লাস দিয়ে আমাকে পাঠালে, আমি বুঝিনি। তাতে কি বিষ ছিল? ওঃ। ভগবান! জলটা ছিল একটু ঘোলা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম; দিব্যেন্দু বলেছিল, টিউবওয়েলের জল, তাই ঘোলা লাগছে। আমার হাত দিয়ে তুমি এত বড পাপ কাজ করালে কেন?

কিছুক্ষণ থেমে কি যেন ভেবে শিউরে উঠল আবার রান্নু।—উঃ ভগবান—। যেটা কিনেছিল সেটা কি তাহলে বিষ—?

দিব্যেন্দু অবশ্য যে বিষ কিনেছিল সেটাই ব্যবহার করেনি। সে অন্য বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল—যেটা সে সংগ্রহ করেছিল রান্নু দেবীর অজান্তে।......

দিব্যেন্দুর পরামর্শেই রান্নু বিয়ের দিন রাত্রে—তার বড়দির জল পড়ে যাওয়া বেনারসী শাড়িটা চেয়েছিল। বিরাট একটা প্রমাণ সরিয়ে ফেলার জন্যে।

কিন্তু, ক্রাইম ডাজ্‌ন্ট্‌ পে—।

পাপ তার স্বরূপ নিয়ে বেরুবেই। আসলে দিব্যেন্দু কী যে চেয়েছিল তা সে নিজেই জানত না। সে শুধু সেই পাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে কালো হল।....

কয়েক মাস পরে যথারীতি মামলা আদালতে উঠল। আত্মীয়

স্বজন সবাই অবাক হয়ে শুনল। দিব্যেন্দু নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, সে চেয়েছে শাস্তি— ফাঁসি। মৃত্যু।

—আমিই খুনী—। বৌদি কিছু জানত না। —সে কোন দোষ করেনি। দিব্যেন্দুর বিবর্ণ মুখে, সজল কণ্ঠের ভগ্ন কাতর স্বীকারোক্তি শুনে শুধু যে বড়দি, শর্মিলা, রানু দেবী অঝোরে কেঁদেছিলেন তা নয়। কর্তব্য কর্মে সদা জাগ্রত কঠোর চিত্ত পুলিশ অফিসারের চোখ ছুটোও মুহূর্তের জন্যে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

দিব্যেন্দুর কান্না-জড়ান স্বর বিচার কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিঘাত হয়ে তীব্র বেদনার সুরে প্রতিধ্বনিত হল—।

সকলের স্তব্ধ কানে বাজতে লাগল মাত্র কটি কথা—

—আমি, আমিই খুনী। বৌদি কিছুই জানে না। ওকে ছেড়ে দিও—ও নির্দোষ, নিরপরাধ।···



ভূত দেখেছেন ? - ভূত।

ডানদিকে বাঁদিকে হেলতে হেলতে গোরস্থান থেকে উঠে-আসা সেই দানব ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো হাঁটে ?

দেখেননি তো ?—আমিও দেখিনি, তবে এই বছর-কয়েক আগে কিছু লোক ভোরের কুয়াশা জড়ানো হাওড়া স্টেশনের শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের ওপর নিজেদের চোখে জেগে জেগে স্পষ্ট এই ভূত দেখেছেন।

তাহলে আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেটাই বলা যাক্।

সালটা ইংরেজী ১৯৬২।

শীতের আবছা অন্ধকারে মোড়া শেষ রাত্রির এক কন্‌কনে ভোর। স্টেশনের ঘড়িটায় তখনও পাঁচটা ঠিক বাজেনি, হাওড়ায়

প্রথম গাড়িটা আসছে। দূরে বাঁশি বাজছে। চারিদিক শীতের কড়া শাসনে যেন কুঁকড়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দু'চারটে মাত্র কুলি মুখে মাথায় কম্বল জড়িয়ে শীতে কাঁপা দেহগুলো নিয়ে উঠবো উঠবো ভাবছে। কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ শীতের মোটা পোশাক পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে।

চারদিক ঘিরে শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশ।

অল্প দূরে কুয়াশার চাদরখানার ভেতর দিয়ে দেখা গেল ধীরে এগিয়ে আসছে রেলগাড়িটা। বাঁশির কান ফাটা শব্দে প্ল্যাটফর্মের সকলে চমকে জেগে উঠল। তারপর কুলিদের এদিক ওদিক দৌড়-ঝাঁপ।

রেলগাড়ি থামল।

যাত্রীরা নেমে গেল, যে যার মালপত্তর নিয়েই চলে গেছে।

কিন্তু এ কি! প্ল্যাটফর্মের ওপর নামানো একটি তোরঙ্গ কেউ নিতে আসছে না কেন?

একজন কুলি তোরঙ্গটার কাছে গিয়ে কান পেতে কী যেন শুনল। তারপরই ভয়ে ভীষণ ভাবে চিৎকার করে উঠল—

—ভূত—ভূত—কথা বলছে! মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে!

এ কি সর্বনেশে কথা! বন্ধ তোরঙ্গের মধ্যে মানুষ! সে মানুষ কথা বলে?

পাহারাতে থাকা পুলিশরা ছুটে এল। দূরের যাত্রীরা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। গেট থেকে কেউ কেউ ফিরে এল।

—কী—কী—কী হয়েছে? চেঁচায় কেন?

—এই তোরঙ্গের মধ্যে ভূত। মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে।

এবার সবাই কান পেতে শুনল—কে যেন তোরঙ্গের ভেতর থেকে বলছে,—খোল—খুলে দাও—মরে গেলুম—জল—জল।

খবর পেয়ে স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন, ছুটে এলেন সহকারী স্টেশন মাস্টার—আর রেলওয়ে পুলিশের বড় কর্তারা।

—ভাঙো—ভেঙে ফেল ট্রাঙ্ক। মানুষ আছে—মানুষ—!

হুম্ দাম্ ঠকাস্...কড়াৎ....কড়্ কড়্ কড়্ কড়াৎ....।

পুলিশের বড় কর্তা নিজের হাতেই তোরঙ্গের ডালাটা চড়্ চড়্ করে টেনে তুলে দিলেন। কুলিরা, যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

—ভূত—ঐ তো শুয়ে রয়েছে সেই প্রেতটা—।

সকলেই হতবাক।

ইস্পাতের বন্ধ তোরঙ্গের মধ্যে মানুষ! জ্যান্ত! সেটা আবার ধীরে ধীরে উঠে বসল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর ভাব। খুব জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

হঠাৎ উঠেও দাঁড়াল লোকটি। বেরিয়ে এল তোরঙ্গের ভিতর থেকে। টল্‌ছে দেহটা। তবু চলতে চাইছে সে।

ডানদিকে বাঁদিকে হেলতে হেলতে চলল লোকটা। গোরস্থান থেকে উঠে-আসা সেই দানব ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো চলার ভঙ্গি।

কিন্তু হাঁটতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—অ্যাম্বুলেন্স ডাকো—কুইক্—।

টেলিফোন করা হল। শহরের তিন কোণ থেকে তিনখানা অ্যাম্বুলেন্স উল্কা বেগে ছুটে এল—হাওড়া ষ্টেশনে।

সমস্ত ঘটনাটা টেলিফোনে আমাদের জানিয়েছিল সুযোগ্য পুলিশ অফিসার ইন্সপেক্টর চৌধুরী। আর 'ভূতের গল্প', সে-ই ঠাট্টা করে আমায় বলেছিল।

তার অনুরোধে লোকটিকে আমরা দেখতেও এলুম।

আধা অচৈতন্য অবস্থায় ট্রাঙ্কের সেই লোকটি বিছানায় শুয়ে রয়েছে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। লোকটির উচ্চতা মনে হল পাঁচ ফুট ছ'সাত ইঞ্চির বেশী নয়। ওজন প্রায় মণ দেড়েক হবে। এক মাথা চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি—ধুঁকছে।

চৌধুরী একদৃষ্টে লোকটির দিকে চেয়ে থেকে বলল,

—একেই নতুন একটা তোরঙ্গে পুরে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। ভাগ্য ভাল, তাই মরেনি।

চৌধুরী আমার দিকে চেয়ে বলল,

—লোকটিকে দেখে কি বুঝলে?

—মনে হচ্ছে, লোকটি শ্রমিক। বহু দিন দাড়ি গোঁফ কামায়নি। আচ্ছা চৌধুরী, মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা দেখেছ? হত্যাকারী কোন অস্ত্র ব্যবহার করল না, গলা টিপেও মারল না—

কথাটা শেষ করার আগেই চৌধুরী বলে উঠল,

—হ্যাঁ, গলা টিপে মারতে চায়নি, তবে নতুন উপায়ে খুন করতে চেয়েছিল। ট্রাঙ্কটা দেখলে বুঝতে ওর মধ্যে য়কটা ফুটো আছে।

চমকে উঠলুম—ফুটো!

—ফুটো কেন? আর ফুটো হলেও ক'টা ফুটো? কোথায় ফুটো? ট্রাঙ্কটা তো বলেছিলে নতুন।

চৌধুরী আমার কৌতূহলে বিশেষ কান দিল না। বলল,

—হ্যাঁ নতুন। ট্রাঙ্কটা লেবোরেটারীতে পাঠালে দেখে নিও। চলো জ্ঞান ফিরলে স্টেটমেণ্ট নেব, এখন ওর জ্ঞান ফিরবে না মনে হচ্ছে। এসো।—

চৌধুরীকে থামিয়ে লোকটির হাত, গলাটা, পা-দুটো বেশ করে পরীক্ষা করলুম। তারপর চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলুম।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞকে সব খবরই দিতে হবে।

চৌধুরী মৃদু হেসে বলল,

—চিন্তার কারণ নেই বন্ধু, এ সোজা কেস। মায়ারাণী হত্যার মতো ঘোরালো কিছু নয়—প্লেন এণ্ড সিম্প্‌ল্‌।

বিস্মিত হয়ে বললুম,

—কি রকম? খুনীর সন্ধান পেয়েছ না কি?

—না তা পাইনি, তবে হত্যাকারী যে এই লোকটিকে ট্রাঙ্কে পুরে লোকটি যাতে দম আটকে মরে যায় তার ব্যবস্থা করেছে, এ তো বোঝাই যাচ্ছে। সুতরাং এই লোকটির জ্ঞান ফিরলেই তার মুখ থেকে সব শুনে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করলেই হবে।

মৃদু হেসে বললুম,

—তারপর হত্যা করার অপরাধে তার পাঁচ-সাত বছর জেল। কিন্তু চৌধুরী, ব্যাপারটা যত সোজা ভাবছ তা না-ও হতে পারে। হত্যাকারীকে ধরলেই তো হল না, প্রমাণ চাই। চেষ্টা করে সে সব প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। 'ঐ খুনী' বলে আঙুল দেখালেই তো চলবে না ভাই।

কিন্তু চৌধুরী মানতে রাজি নয়। সে এই কথাই বলতে চাইল, যে হত্যাকারীকে সে সহজেই ধরবে। আর সেই খুনে বদ লোকটার জীবন শেষ করে ছাড়বে।

—ট্রাঙ্কটা পরীক্ষা করা দরকার, চৌধুরী। ওর সঙ্গে অন্যান্য জিনিস-পত্তরগুলোও পাঠাও। লোকটার স্টেটমেণ্টটা নিয়ে জানিও। মনে হচ্ছে লোকটা শ্রমিক হবে। ট্রাঙ্কটা কত বড় জানো? লম্বায় কত খানি?

চৌধুরী স্মরণ করে বলল,

—মনে হচ্ছে তিন-সাড়ে তিন ফুট হবে। এই লোকটি লম্বায় বোধ হয় পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হবে।

—একটা সাড়ে-পাঁচ ফুট লোককে এর মধ্যে পুরল কী করে?

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠল,

—যেমন করে তুমি ট্রাঙ্কে তোমার লম্বা লম্বা প্যান্টগুলো পুরে রাখো। যারা খুন করতে চাইছে, তারা কি জামাই আদরে শোয়াবে, মুখার্জী?

আমিও চৌধুরীকে চমকে দিয়ে হেঁয়ালী ভাষায় বললাম,—চৌধুরী, জোরালো একটা প্রমাণের আলো আমার মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলে—মনে রেখো। জামাই আদর হত্যাকারী করেনি। অথচ হাতে পায়ে সেই জিনিসটা দেখলাম না কেন?

এরপর সারা পথ চৌধুরী আর কথা বলেনি।

হয়তো ভাবতে চেষ্টা করছিল, ও যেটাকে সহজ বলে ধরছে, আমি সেটাকেই অত্যন্ত জটিল, ঘোরালো ও রহস্যময় মনে করছি কেন? যাকে খুন করা হচ্ছিল সে যখন বেঁচেই গেল, তখন আর হত্যাকারী কে, বা কারা, সেটা খুঁজে বার করা চৌধুরীর মতে মোটেই শক্ত নয়, হত্যাকারীর এত বড় একটা খুনের ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল এটা নেহাৎই এই লোকটির ভাগ্য।

সবই বুঝলুম, তবু কোথায় যেন একটা বড় রকমের 'কিন্তু' রয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, ট্রাঙ্কটা পাঠালেই সব বোঝা যাবে।

এরপর চৌধুরী ষ্টীলের ট্রাঙ্কটা কুলির মাথায় চাপিয়ে ফরেন্সিক লেবোরেটারীর তেতলায় তুলে দিয়ে সেই যে চলে গেল, দিন সাতেক আর দেখা নেই!

শুধু ট্রাঙ্ক নয়, তার সঙ্গে পাঠিয়েছে:

১। একটা ছোট্ট তালা—খুব দামি 'ব্র্যাণ্ড'।

২। একগাছা পাটের লম্বা দড়ি। খানিকটা মাটি; একটা কাগজের প্যাকেট।

৩। একগোছা মাথার চুল—হাসপাতালে মহিউলের মাথা থেকে কাটা হয়েছে।

৪। একটা ময়লা লুঙ্গি, গেঞ্জি, জামা—

৫। কিছু গোঁফ দাড়ির চুল, হাসপাতালে কেটে নেওয়া হয়েছে।

৬। একটা সীল-মারা ফরোয়ার্ডিং মেমো—যাতে একৃজিবিট-গুলোর নাম লেখা আছে আর কী কী পরীক্ষা করতে হবে তার বিবরণ।

এ ছাড়া ঘটনার ইতিহাসও খানিকটা লিখে দিয়েছে চৌধুরী। আর পাঠিয়েছে লোকটির একটা ফটো।

লেবোরেটারীর অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার ট্রাঙ্কের ছবি নিলেন, চুলগুলিরও।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দাড়ির চুল, ট্রাঙ্ক সবই পরীক্ষা করা হল।

ট্রাঙ্কের ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। সত্যিই ওটা রহস্যময়।

হঠাৎ ধূমকেতুর মতো একদিন চৌধুরীর আবির্ভাব।

বলল,—কি হে, অনুবীক্ষণ মুখার্জী, আমার কেসটার কি করলে? কিছু পেলে? মনে হচ্ছে শুরুই করোনি। কি ভাবছ বল তো?

চৌধুরী আমাকে ঐ নামেই ডাকে। কারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আমাদের কাজ। ম্লান হেসে বললাম,

—আমাদের কথা থাক্। ওদিকের খবর-টবর বল? কেসটার ইতিহাসটাও একটু খুলে বল তো!

চৌধুরী অবাক হয়ে বলল,

—ব্যাপার কি হে?—ফরোয়ার্ডিং মেমোতে তো লিখেই দিয়েছি। তোমার অনুমানই ঠিক, লোকটি তার স্টেটমেন্টে

বলেছে যে, সে জুট মিলের একজন শ্রমিক। লোকটির নাম মহিউল হোসেন। নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে লেবার অফিসারের সঙ্গে প্রায়ই ওর ঝগড়া হত। লেবার অফিসারটা মহা বদ লোক, নানা ভাবে এই গরীব লোকটিকে হয়রান করছিল। ঘুষ চাইত—মজুরী কাটত তারপর কোন রকমে শায়েস্তা করতে না পেরে সে গুণ্ডার ভয় দেখায়। বলে, খুন করব একদিন—শেষ করে দেব—মহিউল, তুমি আমাকে চেনো না, আমার হাতে গুণ্ডা আছে।

চৌধুরীকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—থানায় কোন ডাইরী আছে?

চৌধুরী ইতস্তত করে বলল,

—তা তো জিজ্ঞেস করিনি। বোধহয় ডাইরী নেই—থাকলে লোকটি বলত।

—তারপর বলে যাও—। এটা তো শ্রমিক মালিকের চিরাচরিত ব্যাপার।

বলে গেল চৌধুরী,

—শেষে মতলব করে একদিন সন্ধ্যার পর এই লোকটি যখন বেড়াতে বেরিয়েছিল তখন হঠাৎ কয়েকজন গুণ্ডাকে দিয়ে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে বহু দূর নিয়ে যায়। আঠারো দিন একটা ঘরে আটকে রাখে। জায়গাটা হচ্ছে বোধহয় রসুলপুর। কলকাতা থেকে বেশ দূরে।

—কত মাইল হবে কলকাতা থেকে? জিজ্ঞেস করলুম চৌধুরীকে।

—তা—ষাট মাইল হবে—। যেদিন ট্রাঙ্কের মধ্যে লোকটিকে পোরা হয় সেদিন হঠাৎ নাকে রুমাল দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে ফেলে ওরা। তারপর দম আটকে মারার ব্যবস্থা করেছিল ট্রাঙ্কের মধ্যে। কিন্তু আয়ুর জোর তাই লোকটি মারা গেল না।

—তাহলে আসলে লোকটিকে কিড্ন্যাপ্ করা হয় খুন করার

জন্যেই। সবটাই কায়দা করে করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেঁসে গেল। স্থির দৃষ্টি নিয়ে চৌধুরীর দিকে চাইলুম।

—হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র কাজে এল না। তাই খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্যে লেবার অফিসারটিকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রেখেছি। আর শুনলে খুশি হবে অনুবীক্ষণ মুখার্জী, কোর্ট খুনীকে 'বেল' দেননি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪।৩০৭-এর ধারায় ফেলা হয়েছে।

—আচ্ছা চৌধুরী, শ্রমিকটি কি তার দলের—মানে কারখানার ইউনিয়নের পাণ্ডা? আর বেশ স্বাস্থ্যবান, সবল?

এবার চৌধুরী সকৌতুকে বলল,

—তোমার দুটো অনুমানই সত্যি। কিন্তু এবার তোমার এদিক-কার কথা বলো। লেবার অফিসারকে ঝোলাতে না পারলে দেশের আইন কেন আছে? তোমরা কেন রয়েছ? ক্ষমতা আছে বলেই লেবার অফিসার এক গরীব শ্রমিকের ওপর যা খুশি তাই করবে?

—তুমি কিন্তু তদন্তটা জোরালো ভাবে চালাচ্ছো না। আমাদের আরো সঠিক খবর দাও।

এবার চৌধুরীর আত্মসম্মানে বোধহয় আঘাত লাগল। ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে বলল,

—আর কত সঠিক খবর চাও তুমি? ট্রাঙ্ক পাঠিয়েছি। সব মালপত্তরও পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজে গিয়ে হাসপাতালে লোকটিকে দেখেও এলে। আবার কিসে তোমার অসুবিধে হচ্ছে তা তো বুঝি না। এদিকে আজকের খবরের কাগজে বিরাট করে খবরটা বেরিয়েছে—পড়েছ? তুমি তো ব্যাপারটায় গুরুত্বই দিচ্ছ না মনে হচ্ছে।

—আহা চটছ কেন? পড়েছি। এই ত্যাখো না, কাগজটা তো সঙ্গেই রয়েছে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে বড় বড় করে লেখা—

নির্যাতিত নিপীড়িত দরিদ্র একটি কর্মীর প্রতি সুবিচার চাই।

লেবার অফিসারের শাস্তি চাই। ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরে রেলগাড়িতে চড়ানো যা—আর বিষ খাইয়ে মারা বা ছোরা মারাও তাই। এ হত্যা—খুন—। ফরেন্সিক লেবোরেটরীতে পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে। এটা হ্যাভস্ আর হ্যাভ-নটস্-এর দ্বন্দ্ব। গরীব আর ক্ষমতাবান ধনীর ঝগড়া। ইত্যাদি···।

চৌধুরী ভ্রু নাচিয়ে মৃদু হেসে বলল,

—তাহলেই বোঝ, বিবেচনা কর, ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। সামনের সোমবার কোর্ট। যাতে তোমাদের রিপোর্টের জন্যে মামলার দিন পিছিয়ে না যায়, তার প্রতি অনুগ্রহ করে দৃষ্টি রেখো। খুনে লেবার অফিসারের ষড়যন্ত্রটা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

যাবার সময় চৌধুরী আবার বলল,

—একটু ভেবে চিন্তে রিপোর্ট দিও—। তা না হলে বুঝতেই পারো, খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের তুলো ধোনা করে ছাড়বে। আর আদালতে 'ডিফেন্স' ছেড়ে কথা বলবে না। একটু ভেবো চল্লুম। আমার কাজ আছে।

কাজের মানুষ চৌধুরী। আমি বলি, 'মূর্তিমান কর্ম'। সত্যি এমন লোকই পুলিশ লাইনে চাই। ডাকলেই লেবোরেটারীতে ছুটে আসে। যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেয়। পরামর্শ মতো কাজও করে।

তার কথামত সত্যি সত্যিই আবার ভেবেছিলুম আমরা।

প্রথমে ভেবেছিলুম, সর্বনেশে ঐ ট্রাঙ্কের কথা। তারপর বাঁকানো প্লেটগুলোর কথা—যা দিয়ে ট্রাঙ্কের ভেতরের গর্তগুলো ঢাকা দেওয়া ছিল। তারপর আরো পরীক্ষা করেছি ধুলো বালি কয়লায় ভর্তি লুঙ্গি, গেঞ্জি, জামা। কিন্তু····

সেই 'কিন্তু'টা এবারও রয়েই গেল।

শনিবার চৌধুরী এল। এবার খবরের কাগজটা সে নিজেই এনেছে।

বিরাট খবর। সহস্র মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি আদালতের ওপর—।

মহিউল হোসেন মামলা—। এবার হত্যার ইতিহাসে এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করা হয়েছে। এ নিষ্ঠুরতা ইংরেজদের 'ব্ল্যাক্‌হোল্‌ ট্র্যাজেডি'কেও লজ্জা দিয়েছে। রোমান্টিক কিন্তু বীভৎস উপায় উদ্ভাবন করেছেন লেবার অফিসার অর্থাৎ মালিক পক্ষ। গলা টিপে না মেরে দম আটকে মারার চেষ্টা। এর বিচার চাই—ন্যায় বিচার। মালিকের জুলুম চলবে না। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহজেই খুনীকে আবিষ্কার করেছে। তাঁর ধারালো বুদ্ধি, সজাগ দৃষ্টি···ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করেছে।

শেষ কথাগুলো চৌধুরী বেশ গর্বভরেই দু'বার করে পড়ে শোনাল, আমিও আগ্রহ সহকারে শুনলুম।

চৌধুরী কাগজটা পকেটে রাখতেই হঠাৎ প্রশ্ন করলুম

—চৌধুরী, ট্রাঙ্কের ভেতরে অনেক ফুটো আর ফুটো ঢাকা দেওয়া প্লেটগুলো বাঁকানো কেন বল তো?

চৌধুরী উৎসুক হয়ে আমার দিকে চেয়ে কিছু বলার আগেই বললুম,

—মনে হয় বাতাস ঢোকানোর জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর লক্ষ্য করেছ নতুন ট্রাঙ্কের ভেতরে রং করা না থাকার দরুণ তেলের ছাপটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। কিন্তু নতুন ট্রাঙ্কে তেল এল কি করে চৌধুরী?

চৌধুরী শান্ত স্বরে বলল,

—তোমাদের বিদ্যে-বুদ্ধিটা আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাজার কৌতূহলী লোকের সামনে প্রকাশ করো। তবে

তোমাদের এই রিপোর্টের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। তোমরা একজন খুনীকে গারদে পুরবে এটাই সবাই চাইছে। আমার হাতেও অনেক প্রমাণ আছে। যথা সময়েই কোর্টে পেশ করবো।

কয়েকদিন পর।

আদালতে মহিউলের মামলা উঠল।

আদালত-কক্ষ লোকে লোকারণ্য। জজ সাহেব প্রস্তুত হলেন। কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল।

হঠাৎ দৃপ্তকণ্ঠে প্রসিকিউটর জজ সায়েবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন,

—মী লর্ড, আমি আসামীকে অর্থাৎ ঐ লেবার অফিসারকে ক্রশ এক্‌জামিন করতে চাইছি। ইয়োর অনার মে প্লীজ—

জজ সায়েব স্মিত হেসে বললেন,

—ও—ইয়েস্‌—। প্লীজ প্রসিড—

প্রৌঢ় প্রসিকিউটর একটু নীচু হয়ে টেবিলের ওপর ছড়ান কাগজ পত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

লেবার অফিসার তীব্র শঙ্কিত দৃষ্টিতে উপস্থিত জনতার দিকে চাইলেন। তাঁর পক্ষের তরুণ ব্যারিষ্টার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন অভিজ্ঞ প্রসিকিউটারের দিকে।

আদালতের বাতাস হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের একই চিন্তা,—খুনীর শাস্তি হোক।

লেবার অফিসারকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে প্রসিকিউটর গম্ভীর স্বরে প্রথমে প্রশ্ন করলেন—

—আপনি কি ঐ লোকটিকে চেনেন? বেশ ভেবে উত্তর দিন।

—হ্যাঁ—চিনি।

—বোধ করি ভাল করেই চেনেন।

—হ্যাঁ। আমাদের কারখানায় কাজ করে। পুরোনো কর্মী।

—বেশ। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী জানেন?

—জানি।

—মানেন—? আই মীন, দোষ স্বীকার করছেন?

—না। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি নির্দোষ।

—কেন? ও কথা বলতে কি আপনাকে কেউ শিখিয়েছে?

লেবার অফিসার চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ব্যারিষ্টার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,

—ইয়োর ওনার, আই অবজেক্ট। আই অবজেক্ট টু সাচ্ কোয়েশ্চেন।

প্রসিকিউটর হেসে বললেন,

—শিখিয়েছে—কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। ওটা হবে,—আমার লার্নেড্ কাউন্সেল অ্যাডভাইস্ করেছেন—।

জজ সায়েব এবার নিজেই প্রসিকিউটরকে বললেন,

—ওয়েল, আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করুন। টাইম ইজ ওয়েষ্টেড।

বিরস মুখে তরুণ ব্যারিষ্টার বসে পড়লেন। আদালতে সামান্য গুঞ্জন শোনা গেল।

প্রসিকিউটর প্রশ্ন করলেন,

—আপনার সঙ্গে এই মহিউল হোসেনের কেন বনিবনা হত না, তার কারণ আমরা জেনেছি। আপনি লেবার অফিসার আপনার হাতে শ্রমিক ভর্ত্তি করার ক্ষমতা রয়েছে। হ্যাঁ—কি না?

—হ্যাঁ। আমি কারখানার শ্রমিক নিয়োগ করে থাকি।

—ছাঁটাই করেও থাকেন—তাই না?

ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন প্রসিকিউটর।

—হ্যাঁ, প্রয়োজন বোধে তাও করি। করতে বাধ্য থাকি।

—প্রয়োজন না থাকলে করেন? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।

—না। আমি বিনা কারণে ছাঁটাই করি না।

—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমরা জানি আপনি রতন হাজরা বলে

একজন শ্রমিককে গত বছর তাড়িয়েছেন—কারণ সে আপনাকে একশ টাকা ঘুষ দিতে অস্বীকার করে। সেই ব্যাপারের প্রতিবাদ করতে গিয়েই মহিউল আপনার কোপানলে পড়েছে!

—মিথ্যে কথা! রতন হাজরা চুরির অপরাধে ডিস্‌মিস্‌ হয়েছে। তাকে কারখানার মাল চুরি করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পরে মালিককে জানান হলে তিনিই প্রমাণ সাক্ষ্য যোগাড় করে পরে রতনকে জেলে না দিয়ে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলেন! আমাকে ঘুষ দেওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে—।

হঠাৎ তরুণ ব্যারিষ্টার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,

—মী লর্ড, এ ধরণের কথা যদি প্রসিকিউটর বলেন তাহলে আমার মক্কেলের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে, মক্কেল যথেষ্ট মর্য্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সেটা যেন পি-পি অনুগ্রহ করে মনে রাখেন।

প্রসিকিউটর ভ্রু কুঁচকে বললেন,

—আপনি চটছেন কেন? সবই তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখবে। আমায় বলতে দিন। আপনি বসুন। আপনি থাকতে মক্কেলের সুনাম যাবে কেন?

উত্তেজিত তরুণ ব্যারিষ্টার বসে পড়লেন।

আদালতে হাসির ঢেউ উঠল।

প্রসিকিউটর আবার আরম্ভ করলেন—

—মহিউলকে আপনি প্রায়ই তাড়িয়ে দেব বলে ভয় দেখাতেন। কথাটা সত্যি?

—হ্যাঁ। ওকে চাকরীর বিষয়ে সাবধান করে দিতুম। এটুকুই সত্যি।

—কেন? সাবধান করতেন কেন?

—কারণ—মহিউল যখন খুসি কাজে আসত, চলে যেত। আইন মানত না। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর কতকগুলো নিয়ম আছে, সেই অনুসারে ওকে আমি রাখতে পারি না। ওর নামে ডিপার্টমেণ্টের অফিসার

কমপ্লেন করেছেন। আমার কাছে রিট্‌ন্‌ ডকুমেন্ট্‌ আছে। দেখবেন ?

—না থাক। বুঝেছি। মী লর্ড, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, মালিক পক্ষ উঠে পড়ে লেগেছিল একটা গরীব শ্রমিকের অন্নটা ঘোচাতে। তাতে বাধা দেয় মহিউল ও তার সঙ্গীরা—সংখ্যায় তারা প্রায় এক হাজার হবে। মালিক পক্ষ শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে না পেরে মহিউলকে সরাবার পন্থা খুঁজতে থাকে। মহিউলের নামে নানা-ভাবে দুর্নাম রটাতে থাকে। আসলে লেবার অফিসার স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই নিজেই এইসব ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে, সত্যবাদী কর্মনিষ্ঠ অথচ নিতান্তই গরীব শ্রমিক মহিউল হোসেন দিনের পর দিন অত্যাচারিত নিপীড়িত হতে থাকে। ইয়োর অনার, আমার মনে হয় আমার লারনেড্‌ ফ্রেণ্ড ইয়ং ব্যারিষ্টার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই কেসটা হচ্ছে ধনী আর নিঃস্বের দ্বন্দ্ব—সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যা চলেছে স্বাভাবিক ভাবে। এখানে তাই ঘটেছে।

প্রসিকিউটর সামান্য একটু থেমে হঠাৎ দীপ্ত স্বরে বললেন,

—কিন্তু—কেন তা হবে ? গণতান্ত্রিক সমাজে এ হতে পারে না। একটা গরীবের মূল্য একটা ধনীর থেকে কম হবে কেন ?

—কেন এই গরীব লোকটাই নির্য্যাতিত হবে, আর ঐ ধনী অত্যাচারী জঘন্য গর্হিত কর্মে লিপ্ত লেবার অফিসার ন্যায়ের বিচারে শাস্তি পাবে না।

তরুণ ব্যারিষ্টার বাধা দিয়ে বললেন—

—ইয়োর অনার, আমার মক্কেলকে উনি দোষী ধরে নিচ্ছেন। এতে আমার আপত্তি রয়েছে। উনি যেন আমার এই প্রতিবাদটুকু লক্ষ্য করেন। আমার মক্কেল নির্দোষ—আমি সেটা প্রমাণ করে দেব। জঘন্য, গর্হিত কর্ম, এই যে কথাগুলো উনি বলেছেন, তার মধ্যে এই লেবার অফিসার যুক্ত নন। কোন প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত ওঁর হাতে নেই, শুধুমাত্র মহিউলের মুখের কথা ছাড়া। সবই মিথ্যে।

প্রৌঢ় প্রসিকিউটর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। উঁচু গলায় চীৎকার করে উঠলেন,

—প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণ আছে যা দেখে তরুণ ব্যারিষ্টার চম্‌কে যাবেন। মী লর্ড, আপনার অনুমতি পেলেই একজন সাক্ষীকে হাজির করবো—তার মুখেই শোনা যাবে।

জজ সায়েব মাথা নেড়ে বললেন,—ইয়েস্‌।

পুলিশের নির্দেশমত একটি গুণ্ডা গোছের লোক এসে সাক্ষীর বাক্সে উঠল। তাকে বিধি মত শপথ বাক্য পাঠ করান হল।

প্রসিকিউটর জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমার নাম—? থাকো কোথায় তুমি?

—রহমন আমার নাম। থাকি হুজুর বস্তিতে—কলাবাগানে।

—কি কাজ করো? চলে কিসে তোমার?

—আজ্ঞে—!

—কি উপার্জন করো— চাকরী করো? ব্যবসা?

—না হুজুর—সারভিস করি না।

—তবে তোমার চলে কিসে? গুণ্ডামি করে?

—হুজুর—যা বলেন। ভিক্ষে করতে বাপ তো আর শেখায়নি। তাই চুরি করি।

—ও—। পুলিশ তোমায় ধরেছে কেন?

—আমি এসেছি সাক্ষী দিতে হুজুর। আমিই ধরা দিয়েছি। পাপ আর করব না।

সারা আদালতে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল।

প্রসিকিউটর একটু থেমে আবার শুরু করলেন,

—ঐ লেবার অফিসারকে চেন? ঐ যে ভদ্রলোককে?

—হ্যাঁ—চিনি হুজুর—খুব ভাল করে চিনি। নমস্কার স্যার।

হি হি করে রহমন হাত তুলে হঠাৎ লেবার অফিসারকে নমস্কার করে বসল। সবাই অবাক।

ভ্রু কুঁচকে প্রসিকিউটর বললেন, —কি করে চিনলে—? তুমি কি ওঁর কারখানায় কাজ করেছ ?

—আজ্ঞে না হুজুর। সাবভিস বাপেব জন্মে কবিনি। ঐ ভদ্রলোক আমায় অন্য কাজে খাটাল একদিন। প্রচুর টাকা দিল, মদ দিল।

—কি ভাবে খাটাল ? কেন খাটাল ?

প্রসিকিউটর একবার জজ সায়েবের দিকে চেয়ে রহমনের উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রহমন হাসল।

—একদিন রাতে হুজুর, ঐ ভদ্রলোক আমায় ওর বাংলার ঘরে ডেকে নিয়ে এল, বলল কি —টাকা দেব এক হাজার।

তরুণ ব্যারিষ্টার হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল

—সেটা কবে মনে আছে রহমন ? কত দিন আগে ?

চোখ বুজিয়ে রহমন মনে মনে হিসেব করে বলল,

—ডিসেম্বরের প্রথম দিকে হুজুর। বলল কি—, ঢোঁক গিলল রহমন,—একটা লোককে গায়েব করতে হবে—। দিল টাকা পাঁচশ। বলল কি—কাম হোবে তো ফের পাঁচশ। আমি শালা রাজি হলুম। ঐ লোকটাকে বিলকুল লোপাট করে দিলুম।

উচ্চহাস্যে এবার রহমন মহিউলের দিকে হাত তুলে দেখাল। আবার বলল,

—জানুয়ারী মাসে।

জজ সায়েব স্থির কঠিন দৃষ্টিতে রহমনের দিকে চেয়ে বললেন—

—যা বলছ তার শাস্তি কি জানো ?

রহমন হাসি সামলে শান্ত স্বচ্ছ গলায় বলল—

—জেল হবে সার। সে আমি জানি। তবু এই কাজ করি। তা না হলে বৌ ব্যাটা যে না খেতে পেয়ে মরে যাবে। টাকা পাই। ঐ লেবার অফিসার বাবু চাকরী দেয় না—ঘুষ চায়।

মোটা মোটা ঘুষ। না দিলে নট্—চাকরী খতম্—। খেল্ খতম সার।

প্রসিকিউটর লেবার অফিসারের দিকে চেয়ে বললেন,

—এ তো আপনাকে চেনে—একে আপনিও তো চেনেন?

—না—আমি চিনি না। জীবনে চোখেও দেখিনি।

হঠাৎ রহমন উচ্চ হাস্যে বলল—

—সে কি লেবার বাবু, তাজ্জব কি বাত— আমায় চেনেন না? টাকা দিলেন—মদ দিলেন। সব বেমালুম ভুলে গেলেন?

তরুণ ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

—ইয়োর অনার, আমার মক্কেল বলেছেন উনি এই লোকটিকে চেনেন না। সুতরাং এই অভিযোগ মিথ্যে, সাজানো।

এবার রহমন হাত তুলে হি হি করে বিকট স্বরে হেসে বলল,

—থাম থাম বিরিষ্টারবাবু, তুমি তো ছোকরা ছেলে, তুমি কী বুঝবে? থাম।

জজ সায়েবের নির্দেশে রহমনকে থানায় আটকে রাখাব জন্যে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

প্রসিকিউটর ভর্ৎসনার সুরে রহমনের দিকে চেয়ে বললেন,

—ভদ্র ভাবে কথা বলতে জান না রহমন, উনি তোমার ইয়ার? উনি সম্মানের লোক এখানে, এই আদালতে। যাও, বাইরে যাও।

পুলিশ পাহারায় রহমন বাইরে চলে গেল। প্রসিকিউটর অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে বললেন,

—মাপ করবেন—লারনেড্ কাউন্সল্, এই সাক্ষী অন্যায় করেছে। এর জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। লর্ড শিপ যেন এ অন্যায়টুকু এবার মার্জনা করেন। আই এ্যাপোলোজাইস্—। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটে গেল।

তরুণ ব্যারিষ্টার ম্লান হেসে বললেন,

—আমাদের এটা তো রোজের ব্যাপার—। আপনিও তো

অনেক সময় সাক্ষীদের কাছে এ রকম অভদ্র ব্যাপার পেয়ে থাকেন। তাই আমি কিছু মনে করছি না। আমার মক্কেল রহমনকে চেনেন না, দেখেননি। এটাতেই আমি খুসি। রহমনের সাক্ষী সাজানো মিথ্যে, সেটাই বলতে চাই।

প্রসিকিউটর সহাস্যে বললেন,

—ও—ইউ স্টীক্ টু ইয়োর ওন পয়েন্ট্—হ্যাট্স্ গুড্—।

আদালতে হালকা হাসি শোনা গেল। প্রসিকিউটর শান্ত স্বরে বললেন,

—মী লর্ড, তাহলে বোঝা যাচ্ছে—রহমনকে উৎকোচে বশ করে কাজ হাসিল করা হয়েছে। একদিন সন্ধ্যের সময় যখন একা মহিউল কারখানার কাজের পর বেড়াতে বেরিয়েছিল, সুযোগ বুঝে এই রহমনের দলই গিয়ে মহিউলকে অপহরণ করে। প্রমাণের জন্যে আমার সাক্ষী আছে। যদি লর্ডশিপ চান তো—

জজ সাহেব স্থির দৃষ্টিতে মহিউলের দিকে চেয়ে বললেন,

—না থাক—। এনিথিং মোর—?

প্রসিকিউটর মৃদু হেসে বললেন,

—ইয়েস্ মী লর্ড। ফরেন্সিক সায়েন্স লেবরেটারীর রিপোর্ট পেলেই সব মামলাটা বোঝাতে পারবো। ওটা ওঁরা পাঠাননি। তবে এ পর্যন্ত যা বললুম, তা সবই সত্য—, তার থেকেই লর্ডশিপ বুঝতে পারছেন এটা সেই চিরাচরিত মালিক আর শ্রমিক দ্বন্দ্ব।

প্রসিকিউটর বসে পড়লেন। আদালত থম্থম্ করছে। সবাই শান্ত হয়ে রয়েছে।

প্রসিকিউটর তরুণ ব্যারিষ্টারকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

—আপনি ক্রশ একজামিন করতে পারেন। ইফ্ কোর্ট সো প্লিজেস্…।

তরুণ ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। সসম্ভ্রমে বললেন,

—মী লর্ড, আমার আগে আমার লার্নেড কাউন্সেল যা যা

বলেছেন তার প্রতিবাদে আমি বলতে পারি—ও সব মিথ্যে। আমি প্রমাণ সাক্ষ্য যোগাড় করে পরে আদালতে দেখাবো আমার মক্কেল নির্দ্দোষ। আজ আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই।

জজ সাহেব তাঁর জামীনের অনুমতির কথা চিন্তা করে পরে আদেশ দেবেন। ব্যারিষ্টার 'বেল পিটিশান' দাখিল করলেন। সমবেত জনতা ন্যায় বিচারের জন্যে আদালতে আবেদন জানাতে পি-পিকে অনুরোধ জানাল।

পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতের প্রায় সকলকেই এই বলে শান্ত করলেন যে,—অন্যায় যদি কেউ করে তার চরম শাস্তি হবেই।

—গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরণের কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না। আইন মহিউলকে বাঁচাবে—। লেবার অফিসারকে চরম শাস্তি দেবেই দেবে। যদি দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে রেহাই নেই।

বলা বাহুল্য আদালতের উপস্থিত জনতা প্রায় সকলেই মহিউলের বন্ধু—কারখানার শ্রমিক। তারাই সুবিচার চায়।

লেবার অফিসারের জেল হোক্—এই ছিল তাদের স্লোগান।

প্রসিকিউটারের কথায় খুসি হয়ে চুপ করে রইল।

জজ সাহেব একমাস পরে আবার আদালত বসবে বলে সেদিনের মত আদালতের কাজ মুলতুবি রাখলেন ও আসন ছেড়ে ছোট্ট ঘরে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই বিমর্ষ মুখে তরুণ ব্যারিষ্টার বেরিয়ে এলেন। লেবার অফিসারকে হাজতে নিয়ে চলে গেল।

লেবার অফিসারকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হল না। ব্যারিষ্টার হতাশ হলেন।

এক মাস পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালত বসল বটে তবে ফরেন্সিক

রিপোর্ট এল না বলে আবার পনের দিন সময় চাইলেন দু পক্ষই।

সময় মঞ্জুর হল। পনের দিন পরে যথারীতি আদালতে মামলাটা উঠল। প্রসিকিউটর পর পর অনেক সাক্ষী দিলেন।

এবার বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত পদক্ষেপে আসামীর কাঠগড়াতে দাঁড়ালেন লেবার অফিসার। তরুণ ব্যারিষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

জজ সাহেব মাথা নাড়লেন।

—কতদিন আপনি লেবার অফিসারের পদে কাজ করছেন?

—সাত বছর—।

—মহিউল কত দিন কাজ করেছে?

—আরো অনেক আগে থেকে। বোধ হয় বছর দশেক হবে।

—কেমন কাজ করে—আই মীন, ওর সার্ভিস রেকর্ড কেমন?

—ভাল নয়—। সি-সি-আর ওর চিরদিনই খারাপ। মহিউল ইউনিয়নের কাজই করে। কুলি ক্ষেপায়, স্ট্রাইক করায়, নিজে কাজ করে না।

প্রসিকিউটর হঠাৎ উঠে বললেন,

—মা লর্ড—এসব প্রশ্ন শুধু অবান্তর নয়, এসব ইউজ্‌লেস্‌ প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে আমার ফ্রেণ্ড্‌ আইন বিষয়ে এখনও যথেষ্ট অজ্ঞ। ক্রশ একজামিনেশানে তাঁর দক্ষতা আসেনি। উনি ক্ষান্ত হোন্‌।

ব্যারিষ্টার একটু থেমে জজ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন,

—ইয়োর অনার, আমি আদালতকে জানাতে চাইছি যে মহিউল কারখানার কর্মী হিসেবে সুনাম পায়নি। এর জন্যে দায়ী তার কর্মবিমুখতা ও ঔদ্ধত্য। মহিউল কাজ ফাঁকি দিয়ে রোজ সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি ইউনিয়ন করে। অসঙ্গত দাবি আদায়ের জন্যে কারখানায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করে।

ব্যারিষ্টার থামলেন। জজ সাহেব ব্যারিষ্টারকে লক্ষ্য করে বললেন—

—ইয়েস্—প্রসিড্—। ইউ হ্যাভ্ রেজ্ড্ ইম্পর্টেন্ট্ পয়েন্ট্।

এবার উৎসাহী ব্যারিষ্টার লেবার অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

—মহিউল কি ছুটি নিত খুব বেশী, যখন তখন ?

—সেটা আমি জানি না। ডিপার্টমেণ্ট বলতে পারবে।

—আপনি ছুটি নেন? শেষ কবে নিয়েছেন? ভেবে বলুন।

প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়িযে বললেন।

—সময় নষ্ট ছাড়া এ সব প্রশ্ন করার কোন দাম নেই।

মৃদু হেসে ব্যারিষ্টার বললেন,

—এখুনি বুঝবেন দাম আছে কি নেই। বলুন তো আপনি—।

—হাঁ। ছুটি নিয়েছিলুম ডিসেম্বরে গত বছর।— জয়েন করেছি জানুয়ারীতে। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। হোটেলে ছিলুম। নাম—সমুদ্রিকা হোটেল।

ব্যারিষ্টার এবার সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে জজ সাহেবের দিকে মুখ তুলে বললেন,

—ইয়োর অনার, আমার ক্লায়েন্ট্ লেবার অফিসার বলছেন, উনি গত বছরে ডিসেম্বরে ছুটি নিয়েছিলেন। জয়েন করেছেন জানুয়ারীতে। এবার তাহলে আমাদের লারনেড পাবলিক প্রসিকিউটর যে সাক্ষী এনেছিলেন তার কথা স্মরণ করছি। সাক্ষীর নাম রহমন্। সে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, লেবার অফিসার তাকে ঐ ডিসেম্বরে একদিন রাত্রে তার বাংলাতে ডেকে পাঠিয়ে পাঁচশ টাকা ইনাম দেন আর বোতল বোতল মদ খাওয়ান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে লোকটা পুরীর সমুদ্রিকা হোটেলে সারা ডিসেম্বর মাসটা কাটাল, সে কি করে

জুট মিলের বাংলাতে ঐ একই মাসে রহমনকে পাঁচশ টাকা দস্তুরী দিয়েছিল ?—কোনটা সত্যি ?

সমস্ত আদালতে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। তরুণ ব্যারিষ্টার সসম্ভ্রমে বললেন,

—মী লর্ড, রহমান মিথ্যে বলেছে, এই আমার নিবেদন। আমার ক্লায়েণ্ট, সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ। তাঁর পক্ষে এ ধরণের কাজ করা অসম্ভব। একটা ট্রাঙ্ক কিনে তার ভেতর মানুষ ভরে ট্রেনে চালান দেওয়া তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত। আর তা ছাড়া কেউ এই কুকর্মের সাক্ষী নেই, মী লর্ড।

জজ সাহেবের ঠোঁট দুটোতে পাতলা হাসির ঢেউ খেলে গেল। শান্ত স্বরে বললেন—

—আপনার ক্লায়েণ্ট যে গিল্‌টি নন তার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে মহিউল হোসেনের অভিযোগ মিথ্যে বলে আদালতে প্রমাণ করুন।

তরুণ ব্যারিষ্টার শুষ্ক ঠোঁটটা জিভ দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,

—মী লর্ড, ফরেন্সিক রিপোর্ট এখনও আদালতে এসে পৌঁছোয় নি। লর্ড শিপ যেন সেই রিপোর্ট আসা অবধি অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করেন। এই আমার প্রার্থনা।

—মহিউল কেসের সমস্ত এক্‌জিবিট—যা ফরেন্সিকে পাঠান হয়েছিল সবই এসে গেছে। যতদূর শুনেছি, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আসবেন। কবে জানি না। পি পি বলতে পারবেন।

প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—ইয়েস্ ইয়োর অনার, ফরেন্সিক জানিয়েছেন রিপোর্ট তাঁদের প্রস্তুত। তবে আরো দুটো দিন সময় চেয়েছেন।

ফরেন্সিকের মূল্যবান রিপোর্টের ওপরে এই মামলাটা নির্ভর করছে।

জজ সায়েব গম্ভীর স্বরে বললেন,

—ঐ দিন রিপোর্ট না পেলে এই কেসটার জন্যে আর ফার্দার্ দিন দেওয়া হবে না।

—প্লীজ্ রিমেম্বার—।

সামনের বুধবার।

সেই স্মরণীয় বুধবার।

ঐ দিনে থমথমে আদালত কক্ষে ঢুকে লম্বা কাঠগড়ার মাঝখানে দাঁড়ানো লেবার অফিসারকে একবারের জন্যে দেখে নিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ।

জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত। মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। মহিউলের অভিযোগ খণ্ডন করার মত কোন অস্ত্র তাঁর নেই। রণক্ষেত্রে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সাক্ষী বাক্সে উঠলেন, শপথ বাক্য পাঠ করলেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন

—আপনিই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ?

—হ্যা।

—আপনিই মহিউলের কেসের এক্জিবিট পরীক্ষা করেছেন?

—হাঁ। রিপোর্ট সঙ্গে এনেছি। অ্যানালিটিক্যাল্ রিপোর্ট।

—আপনার রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করি।

প্রসিকিউটর বসে পড়লেন। তরুণ ব্যারিষ্টার, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। জজ সাহেব অনুমতি দিলেন না।

বিশেষজ্ঞ বললেন,

—ওয়ান্ মিনিট প্লিজ– কাগজপত্তরগুলো সাজিয়েনি।

এক মিনিট কেটে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ে আদালতের পক্ষ থেকে সুরু করার তাড়া এলো।

—ইয়েস্ প্রসিড,—

জজ সায়েবের গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত হলেন।

এবার তাঁকে প্রমাণ করতে হবে এমন একটি ঘটনা যা প্রকৃতই বিস্ময়কর, যা ভয়ঙ্কর,—কিন্তু কঠিন সত্য।

উদাত্ত স্বরে আরম্ভ করলেন তিনি,

—ইয়োর অনার, এই আদালতে উপস্থিত সবাই হাওড়ার বন্ধ ট্রাঙ্কের কাহিনী শুনেছেন এ কাহিনী যেমন রহস্যাবৃত, তেমনি অভিনব।

-বিরাট একটা ষড়যন্ত্র করে মহিউল হোসেন নামে একটি শ্রমিককে দম আটকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে কথা আমরা মহিউলের স্টেট্‌মেন্টেই পেয়েছি। কিন্তু মহিউল মারা যায়নি। তার কারণ, আপনারা হয়তো বলবেন, আয়ুর জোর। সেটা ঠিকই, তবে এটাও ঠিক, যে ও যাতে মারা না যায় তার ব্যবস্থাও কিন্তু হত্যাকারী করে দিয়েছিল, যদিও সেটা খুব কার্য্যকরী হয়নি।

আদালত —প্লিজ, ক্ল্যারিফাই।

- বলছি। একটা ভূমিকা করলুম। এবারে আসল কথায় আসছি।

সবার প্রথমে ধরা যাক ট্রাঙ্কের ভেতরের গর্তগুলোর কথা। পরীক্ষা করে আমরা ট্রাঙ্কের ভিতরের এক কোণে চারটে ছোট ছোট গর্ত পেয়েছি। এই গর্তগুলোর ওপর যে 'প্লেট' ঢাকা দেওয়া ছিল, তার সবকটাই বাঁকানো, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে, ট্রাঙ্কটা নতুন কেনা। সুতরাং এই ধরণের গর্ত ও বাকানো প্লেট থাকার কথা নয়। কিন্তু ছিল। এর থেকে বোঝা যায় ট্রাঙ্কের ভেতর বেশী পরিমাণ হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রাঙ্কের তালাটা নতুন—কোথাও কোন আঁচড় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

—দ্বিতীয়ত, মহিউল হোসেন তার স্টেট্‌মেন্টে বলেছে যে দীর্ঘ

আঠারো দিন তাকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়, তার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হয়, খুন করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর রুমালে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ওর নাকে চেপে ধরে অজ্ঞান করে ট্রাঙ্কে পুরে ফেলা হয়। এত সব কাণ্ড কারখানা করে রেলগাড়িতে চড়ানো হয়। এও সে বলেছে যে তাকে রসুলপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—হাওড়া থেকে যার দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল

—এবার ট্রাঙ্কের ভেতরে পাওয়া তেলের কথায় আসা যাক।

—ট্রাঙ্কটা পরীক্ষা করে আমরা ট্রাঙ্কের ভেতরে লম্বার দিকে একজায়গায় মাথায় মাখবার গন্ধ তেলের ছাপ পাই। বলা বাহুল্য, সে তেল ভেজিটেব্‌ল্‌ অয়েল। কিন্তু নতুন ট্রাঙ্কে তেলের দাগ এল কোথা থেকে? সম্ভবত মহিউল বলে যে লোকটি ট্রাঙ্কের মধ্যে শুয়েছিল তারই মাথার তেল ঐ ট্রাঙ্কের গায়ে লেগেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তা কি করে হবে? মাথায় তেল মাখলে কতদিন সে তেল মাথায় থাকবে?

বিশেষজ্ঞ বললেন,

—মাথায় তেল মাখলে সে তেলটুকু আটচল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ দুদিন মাথায় থাকে, তারপর শুকিয়ে যায়। সুতরাং মহিউল দুদিনের মধ্যে কোন এক সময় তেল মেখেছিল।

প্রসিকিউটর সন্দিগ্ধ ভাবে বললেন,

—তা কি করে হবে!

প্রসিকিউটরের কথার উত্তর না দিয়ে, বিশেষজ্ঞ শান্ত স্বরে বললেন,

—আর তা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে এ কথা মিথ্যে যে মহিউলকে আঠারো দিন একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, যে কথা মহিউল তার স্টেট্‌মেণ্টে বলেছে।

বিশেষজ্ঞ থামলেন। আদালতে অপেক্ষারত বিরাট জনতার ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

আদালতের সহস্র মানুষের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য চাপা গুঞ্জন উঠল।

—ইয়েস্ প্রসিড্—

গুঞ্জন থেমে গেল, আবার স্তব্ধতা।

বিশেষজ্ঞ শুরু করলেন। এবার একটু জোরাল কণ্ঠ। কখনো উত্তেজনায় সে কণ্ঠস্বর হল কম্পমান, কখনো বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে শান্ত, দৃঢ় ও স্বচ্ছ।

— যদি আমাকে কেউ খুন করব বলে ঘরে আটকে রাখে, নির্মম ভাবে মারধোর দেয়, অকথ্য অত্যাচার করে, তবে সে কি স্নান করার জন্যে সুগন্ধি তেল দেবে, না সাবান দেবে? তাহলে মহিউল তেল পেল কোথায়? পর পর তিন বার হাসপাতালে গিয়ে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, মহিউল মাথায় মাথার জন্যে তেল আনাতো, সুগন্ধি তেল। তার গন্ধ ঐ তোরঙ্গের ভেতরে লেগে থাকা তেলের গন্ধের সঙ্গে এক, অর্থাৎ ঐ বিশেষ ধরণের তেলই মহিউল ব্যবহার করতে ভালবাসে। স্বাভাবিকভাবে সেই তেলই সে মেখেছিল। এবং মেখেছিল সে দু'দিনের মধ্যে যে কোন এক সময়ে। এ ছাড়া আরো প্রমাণ আছে, যাতে আদালত বিস্মিত হবেন।

—কি বলুন—।

—তা হচ্ছে, মহিউলের মাথার চুল, দাড়ির চুল, গোঁফের চুল।

—মহিউল তার স্টেট্‌মেণ্টে বলেছিল যে তাকে যেদিন 'কিড্‌ন্যাপ্' করা হয় সেদিনই সে চুল দাড়ি কেটেছিল। তাহলে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মহিউল আঠার দিন আগে চুল দাড়ি শেষ কাটে। তার কারণ, বন্দি অবস্থায় সে চুল দাড়ি কাটতে পারে না। আদালতে কিন্তু আমি জানাতে চাই যে মহিউলের চুল পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি, মহিউলের মাথার চুলের বৃদ্ধি ঘটেছে পাঁচ দিনের মধ্যে. মাথার চুলের অগ্রভাগ বা 'টিপ্'টা পরীক্ষা করে আমরা বলতে পারি কত দিন আগে মাথার চুল কাটা হয়েছে। সেই টিপের আকার

দেখে—বলা বাহুল্য মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষা করেই জানা যায়—আমরা বলছি, মহিউলের মাথার চুল খুব বেশী দিনের কাটা নয়। গোঁফের চুলও তাই—। দাড়ির চুল এক সপ্তাহের।

—মাথার চুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্‌'-এর আকার বদলাতে থাকে। তাই প্রমাণ হয় যে মহিউলের মাথার চুল চার পাঁচ দিন আগেই কাটা হয়েছে। দাড়ি কামিয়েছে সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন সময়। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ চুল পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে মহিউল মিথ্যে বলেছে।

—এরপর দড়ির কথায় আসা যাক। আমরা অন্যান্য এক্‌জিবিটের মধ্যে এক গাছা দড়ি পাই। এই সেই দড়ি। এই দড়ি দিয়ে মহিউলকে বেঁধে ট্রাঙ্কের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল একথাও বলেছিল। তা ছাড়া ট্রাঙ্কের মধ্যেও তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। এ কথা সত্যি। কিন্তু মহিউলের হাতে পায়ে কোথাও কোন লিগেচার মার্ক অর্থাৎ দড়ির দাগ আমি পাইনি। ডাক্তারও পানান। কেন? যারা বন্য মানুষের মতো নির্মম অত্যাচার করেছিল, ঘরে না খেতে দিয়ে আঠারো দিন আটকে রেখেছিল, খুন করার ব্যবস্থাও করেছিল। তারা যদি দড়ি দিয়ে সত্যিই বাঁধতে চাইত তো কড়্‌কড়ে করেই বাঁধত, আল্‌তো করে জড়িয়ে দেবে কেন?

—একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করে আসল বস্তুর ওপর আমার বক্তব্য রাখব।

—দীর্ঘ আঠারো দিন মহিউল হোসেন নিখোঁজ হয়েছিল। কিন্তু তার বাড়ির লোকেরা পুলিশে ডায়রি করেনি কেন? হাসপাতালে দৌড়োদৌড়িও করেনি—সে ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে ইন্সপেক্টর চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন যে, গুণ্ডারা খুন করার ভয় দেখাত মহিউলকে তা নিয়ে সে কোনদিন থানায় ডাইরী করেনি। মালিককেও জানায়নি।—কিন্তু কেন?

—কোনদিন জানায়নি, তার কারণ এই হতেও পারে যে, মহিউল

প্রাণ ভয়ে মালিকের সাহায্য চায়নি, কারণ লেবার অফিসার তো মালিকেরই লোক।

আদালতের প্রশ্নে সামান্য একটু থামলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। পরে বললেন,

—আমরা ভুলে যাব না যে, মহিউল ওদের লেবার ইউনিয়নের পাণ্ডা। সুতরাং মালিকের গুণ্ডার ভয় তার কাছে তুচ্ছ। এ ছাড়া পুলিশের সাহায্য চাইলে ওর হয়ে সাক্ষী দেওয়ার লোকের অভাব হত না। আসলে ওদের মিল এলাকা থেকে কয়েকজন গুণ্ডা হঠাৎ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, এটাই তো বিশ্বাস হয় না। তাহলে পাড়ায় কি একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটত না?

—পরের এক্‌জিবিটে আসুন।

—হ্যাঁ, এবার আসা যাক আসল এক্‌জিবিট, স্টীল ট্রাঙ্ক। রহস্যময় ট্রাঙ্কটার শুধু ভেতরটা নিয়েই আলোচনা করি। মহিউল ট্রাঙ্কের ভেতরে শুয়েছিল। সেই ট্রাঙ্ক ছিল বন্ধ। তাহলে দেখতে হবে, মহিউলের বয়স কত? উচ্চতা কত? আর ওজন কত?

—এ সব কেন?

জিজ্ঞেস করলেন আদালত।

—কারণ ২৫।২৬ বছরের একটি ছেলে যদি একটা বন্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে থাকে তাহলে সে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে? এ প্রশ্ন আমাদের মনে বিশেষ করে জেগেছিল। এ ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞান শাস্ত্রের 'রেস্‌পিরেটরি ফিজিয়োলজি'র বিশেষজ্ঞ ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ কলকাতার ফিজিয়োলজির অধ্যাপক ডাক্তার এইচ, এল, সাহা মহাশয় বলেছেন,—একজন সুস্থ মানুষ প্রতি মিনিটে বাতাস থেকে ২৫০ সি সি অক্সিজেন গ্রহণ করেন ও প্রতি মিনিটে ২০০ সিসি কার্বন-ডাই-অক্সাইড্‌ ছেড়ে দেন। এক হাজার সি সি হচ্ছে এক লীটার। যে ট্রাঙ্কটা পাওয়া গেছে তাতে বাতাস ধরে ২১৮ লীটার।

—এটা ব্যাখ্যার দরকার—বোঝা গেল না।

বললেন ডিফেন্স।

—ইয়েস্। আপনি যতটা সম্ভব সোজা করেই বলুন—।

—আমি ব্যাখ্যা করিনি এখনও। শুধুমাত্র এইটুকুই বলেছি যে ২১৮ লীটার বাতাস ট্রাঙ্কে ধরে। কিন্তু কি প্রমাণ? ট্রাঙ্কটা লম্বায়—৯০ সেন্টিমিটার, চওড়ায়—৫৭ সেন্টিমিটার আর উচ্চতায়—৪১·৫ সেন্টিমিটার। তাহলে লম্বা, চওড়া আর উচ্চতা যদি আমরা গুণ করি, কী পাব?

—ভল্যুম।

বললেন ডিফেন্স।

—হ্যাঁ। অর্থাৎ আয়তন। যে আয়তনটা ট্রাঙ্কের ভেতরে পাচ্ছি তার সব জায়গাটাই জুড়ে থাকছে বাতাস। সুতরাং ট্রাঙ্কের মধ্যে কতটা বাতাস থাকছে তার পরিমাণ বের করতে গেলে অঙ্ক শাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতার গুণফলের দরকার। এইভাবে আমরা পেলুম ২১৮০২৫ কিউবিক্ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ২১৮ লীটার।

—বেশ, বোঝা গেল। তারপর?—

—কিন্তু ২১৮ লীটার বাতাসের সমস্তটাই ট্রাঙ্কের ভেতর ছিল না।

—কেন?

আদালতের বিস্ময় চরমে উঠতে লাগল।

—কারণ মতিউল যে জায়গাটুকুতে কুঁকড়ে, পা মুড়ে শুয়েছিল সেখানে বাতাস ছিল না। বাতাস সরিয়ে দিয়ে তবেই তো তার দেহটা ছিল। লোকটির উচ্চতা—৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ওজন—১ মন ১৫ সের। তাহলে দেহটা কতটা বাতাস সরিয়েছে?—১২৫ লীটার, এ কথা ডাক্তার সরকার আমাদের জানালেন তাঁর রিপোর্টে।

—তাহলে আপনি বলছেন, ২১৮ লীটার বাতাস ট্রাঙ্কে ধরা উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু ১২৫ লীটার বাতাস কম হল সুতরাং যখন ট্রাঙ্কটা রেলগাড়িতে আসছিল তখন তাতে ৯৩ লীটার বাতাস ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু বাতাসের সবটাই তো অক্সিজেনে ভরা নয়। অক্সিজেন হচ্ছে বাতাসের ৫ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। তাহলে ৯৩ লীটারের ৫ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছে প্রায় ধরা যেতে পারে ১৯ লীটার। আসল হিসেবটা হচ্ছে ১৮৬০০ সি-সি।

— প্রতি মিনিটে আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি, ২৫০ সি-সি। তাহলে ৭৪.৪ মিনিট সময় মাত্র মহিউল ট্রাঙ্কের ভেতরে অক্সিজেন পাবে। অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। কিন্তু এতটা সময়ও ওর পাওয়াব কথা নয়। কারণ, ট্রাঙ্কটা বন্ধ ছিল। এ কথা ভুললে চলবে না।

—তাতে কি হল ?

—তাতে হয়েছে এই যে, ট্রাঙ্কেব মধ্যে 'হিউমিডিটি' ছিল। কারণ মহিউলের শরীর থেকে ঘাম বেবিয়েছে। সে বেঁচে থাকতে তার শরীরে স্বাভাবিক নিয়মে রক্ত চলাচল হয়েছে। গরম ভাপ বেরিয়েছে। তাই অক্সিজেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে।

—একটা গল্প বললে ব্যাপারটা সোজা হবে।

—এক ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে শুয়েছিলেন। মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। ছোট ঘরখানা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

—দরজা খুলে বেরোতে গেলেন। কিন্তু খিল খুলতে পারলেন না।

—কেরোসিনের আলো নিভে গেল। শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

—যখন পাশের ঘরের লোক দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করল, তখন তিনি মৃত।

—কেন এমন হল ?—কেরোসিন আলো জ্বালার জন্যে ঘরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়তে বাড়তে ঘরের ভেতরের সমস্ত বাতাসের অক্সিজেনকে গ্রাস করেছিল।

বাইরে থেকে অক্সিজেন আসার সুযোগও ছিল না। দরজা বন্ধ ছিল।

—এই ট্রাঙ্কের ব্যাপারেও তাই-ই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

—কিন্তু কেন, কেন হয়নি ?

প্রশ্নটা বিশেষজ্ঞ নিজেই করে বসলেন।

আবার উত্তরও দিলেন।

—কারণ, মহিউল হোসেনের ষ্টেট্‌মেণ্ট সম্পূর্ণ মিথ্যে। তাকে রসুলপুর থেকে কেউ ট্রাঙ্কে পুরে পাঠায়নি। হিসেবে দেখা যায়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ যেভাবে ট্রাঙ্কের মধ্যে বাড়বে তাতে মহিউলের বড় জোর আধ ঘণ্টা বাঁচার কথা—এর বেশী নয়। কিন্তু ৫০-৬০ মাইল পথ রেলগাড়িতে আসতে কম করেও কিছু না হোক এক দেড় ঘণ্টার বেশী তো লাগবেই।

—তাহলেই মনে হয়, মহিউলকে লিলুয়ার কাছে থেকেই কেউ ট্রাঙ্কে ভরে হাওড়াতে পাঠিয়েছিল। তাহলে, তাকে আঠারো দিন লেবার অফিসারের গুণ্ডারা একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল এবং পরে রসুলপুর থেকে ট্রাঙ্কে পুরে হাওড়া পাঠিয়েছে, এসব কথাই সাজানো। তাছাড়া মহিউলের লুঙ্গিতে, গেঞ্জিতে চুল ছাড়াও লাল বালি, কয়লাগুঁড়ো পাওয়া গেছে।

—মহিউল বলেছে, যে সন্ধ্যার সময় যখন কাজের শেষে চান-টান করে কারখানার জামা কাপড় ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, তখন গুণ্ডারা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। ঘরে বন্ধ করে রাখে ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

—তাহলে ওর পোশাকে বালি, কয়লা এল কি করে ?

বিশেষজ্ঞ থামলেন।

লেবার অফিসার শ্রান্ত দৃষ্টিতে বারবার বিশেষজ্ঞের দিকে চাইতে লাগলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন বুঝি ভরে গেছে।

বিশেষজ্ঞ জজ সায়েবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন,

—এর পর আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলবো সেটি হচ্ছে: একটা

কাগজের প্যাকেটে খানিকটা মাটির মত জিনিষ।

আবার বিশেষজ্ঞ থামলেন।

প্রসিকিউটরের নির্দেশে একজন পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল্‌ কাগজেব প্যাকেটটা তুলে ধরল। জজ সায়েব একটু উঁচু হয়ে কাগজের ভেতরেব জিনিষটুকু দেখে বললেন।

—মাটি মনে হচ্ছে। কী ওটা?

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ কাগজটা পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল্‌-এব কাছ থেকে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন.

—হ্যাঁ— এটা মাটি—গঙ্গা মাটি! এই মাটিটকু পুলিশ ইন্সপেক্টাব মহিউলের পায়েব তলা থেকে সংগ্রহ কবেন। একটা ছোট্ট ছুরি দিয়ে মাটি চেঁচে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মহিউলের পায়ের তলায় গঙ্গা মাটি এল কী করে—?

—আমরা স্মরণ করতে পারি মহিউল বলেছিল তাকে গুণ্ডারা সন্ধ্যের সময় 'কিড্‌ন্যাপ্‌' করে। তাবপব বেশ কযেকদিন তাকে একটা ঘরে আটক থাকতে হয়।

তাহলে টাটকা মাটি লাগল কি কবে?

সন্দেহ জাগতে আমরা গঙ্গার ধারে মহিউল যে জুট মিলে কাজ করে সেটা ছাড়াও আর যে কটা জুট মিল আছে সব কটারই ম্যানেজারের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলুম। সাহায্য চাইলুম।

--কি পরামর্শ করলেন? কি সাহায্য চাইলেন?

আদালত প্রশ্ন করলেন।

বিশেষজ্ঞ বললেন,

—আমাদের কাছে মহিউলের একখানা ফটো আছে। ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি জুট মিলের ম্যানেজারকে মহিউলের ফটো পাঠিয়ে জানতে চাইলুম তাঁর মিলের কোন কর্মচারী এই ফটোটি চেনে কি না।

মহিউল সে সব মিলে কাজ করেছে কি না। দুটো মিল থেকে উত্তর এলো, না—। ফটো কেউ চেনে না।

আমরা চিন্তিত হলুম। তাহলে…? তাহলে আমাদের ধারণা কি ভ্রান্ত হবে?

—অপেক্ষা করে রইলুম তৃতীয়টার জন্যে। হঠাৎ চিঠি এল—হ্যাঁ, ফটোটি মিলের কয়েকজন শ্রমিকের পরিচিত। যার ফটো তারা দেখছে তার নাম ফকির আলী মোল্লা। মাত্র পনের দিন সে মিলে চাকরী করে। তারপর বিনা নোটিশে কাজ ছেড়ে দেয়।

আদালত প্রশ্ন করেন,

—কোন্ পনের দিন?

বিশেষজ্ঞ একখানা চিঠি বের করে পড়ে নিয়ে বললেন,—যে আঠারো দিন মহিউল আত্মগোপন করেছিল। সেই আঠারো দিনের মধ্যে পনের দিন সে ছদ্মনামে অন্য মিলে কাজ করে। পাছে কারো নজরে পড়ে, তাই গোপনে গোপনে মহিউল হোসেন গঙ্গার ধার দিয়ে পলিমাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে জুট মিলে কাজ করতে যেত। জুট মিলে যে দলটায় সে শ্রমিক হয়ে কাজ করত সেই দলের সবাই তাকে চিনতে পেরেছে। তবে ওরা চেনে ফকির মোল্লা নামে, মহিউল হোসেন নামে নয়। মিলের শ্রমিকদের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিষ্টারে দেখা গেছে, মহিউল ওরফে ফকির মোল্লা, ঐ পনের দিনে দু-বার মাইনে পায়। আর সে টাকা নেবার সময় অতি সাবধানী মহিউল হোসেন মস্ত বড় একটা প্রমাণ রেখে দেয় খাতার ওপর।

আরও রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে বিশেষজ্ঞ থামলেন।

আদালত কক্ষে থম্‌থমে ভাব।

উপস্থিত দর্শকদের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। অধীর প্রতীক্ষায় সবাই নজর ফেলে আছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দিকে।

যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একটু

একটু করে উঠছে এমন এক ট্রাঙ্ক রহস্যের অলক্ষ্য যবনিকা। যা ছিল পরিষ্কার, স্বচ্ছ—আপাত দৃষ্টিতে, তার গভীর গহনে পড়েছে ফরেন্সিকের সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানের আলো। কোন ফাঁকি সেখানে চলে না।

এই বোধটুকুই হয়তো সেদিনের উৎসাহী শ্রোতা দর্শকদের কারো কারো মনে জাগিয়ে তুলছিল কৌতূহল, ঔৎসুক্য—আরও কী আছে যবনিকার ওপারে, যা ধর্মাধিকরণের ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডে আহৃত হবে? মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজে কত রহস্যের, কত অজানার সন্ধান ফরেন্সিকের গবেষণায়, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যে মিলছিলো তা, এক এক করে। আরও কতো রহস্য আছে? তাই এর পর বিশেষজ্ঞ কি বলবেন শোনার জন্যে কৌতূহলী জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছেন।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল।

বিশেষজ্ঞ ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন,

—মহিটল খাতায় রেখে গেছে—ফিঙ্গার প্রিন্ট্। নাম আলাদা হলেও ফিঙ্গার প্রিন্ট্—বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ—পরীক্ষায় আলাদা হল না। মহিটল যে জুট মিলে শ্রমিক হয়ে রয়েছে, আর যে মিলে পনের দিন লুকিয়ে কাজ করেছে,—দুটো মিলেই সেই একই আঙ্গুলের ছাপ আছে। আর সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যে দুটো আঙ্গুলের ছাপই আমরা সংগ্রহ করেছি। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি—ছাপ দুটি অভিন্ন—আইডেন্টিক্যাল। আমাদের বিশ্লেষণের বিবরণ এইখানেই শেষ।

এর পর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সাক্ষী বাক্স থেকে নেমে এলেন।

আরও বেশ কিছুক্ষণ আদালত কক্ষ রইল নিস্তব্ধ।

সকলের দৃষ্টি পড়ল লেবার অফিসারের ওপর।

পরের দিন 'রায়' দেবেন এই কথা জানিয়ে বিচারক আসন ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

এবার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারটাকে আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক্।

মহিউলের গেঞ্জি জামা পরীক্ষা করে আমরা লালচে মাটি ও কয়লার গুঁড়ো পেয়েছি। ট্রাঙ্কের মধ্যেও ঐ একই জিনিষ।

কয়লার গুঁড়ো, মাটি। এই ধরণের লাল মাটি, বর্দ্ধমান, আসানসোল ঐ সব জায়গায় পাওয়া যায়। কলকাতার আশেপাশের মাটি লাল নয়। তার থেকেই মনে হয় মহিউল বর্দ্ধমান বা ঐ এলাকার কোন জায়গায় ছিল।

পুলিশ অফিসার একটা মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন। তিনি কি ভাবে যেন খোঁজ নিয়েছেন যে মহিউলের এক চাচা বর্দ্ধমানে থাকেন।

কর্মোপলক্ষে আসানসোলেও যান। সেখানেও তাঁর বাড়ি আছে।

মহিউল এই ঘটনা ঘটবার তিনদিন আগেই চাচার বাড়ি যায়। সেখানেই এই ট্রাঙ্কটা কেনে। এ কথা ওর চাচার বাড়ির দারোয়ান পুলিশকে বলেছে।

কেনার পর দারোয়ানের ঘরেই ট্রাঙ্কটা রাখা ছিল।

তারপর মহিউল কলকাতা আসার সময় ট্রাঙ্কটা নিয়ে আসে।

বলা বাহুল্য তারপরে কোন ঘটনার বিন্যাসে কলকাতার কাছাকাছি কোন স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে সেই ট্রাঙ্কটি হাওড়ায় এসে পৌঁছয়।

আর সেই ট্রাঙ্কের মধ্যে আবদ্ধ ব্যক্তি ছিল—মহিউল।

আমার আর কিছু বলার নেই।

ইন্সপেক্টার কোথায়, কি ভাবে মহিউলের কাকার সন্ধান পান ও রহস্যময় এই ট্রাঙ্কের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন, সে কথা তিনিই বলবেন।

পরের দিন চৌধুরী এল।

সুখবর দিল, মহিউল তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আদালত তার শাস্তির ব্যবস্থাও করেছেন। আর বেকসুর খালাস পেয়েছেন অভিযুক্ত লেবার অফিসার।

হঠাৎ ইন্সপেক্টার চৌধুরী একটু থামল। তারপর মৃদু হেসে বলল,

—কোর্ট তোমাদের প্রশংসা করেছেন—। খুসি হলে তো?

খুসিতে মনটা সত্যিই ভরে গেল। শান্ত স্বরে বললুম,

—আদালত প্রশংসা করেছেন বলেই যে আনন্দ হচ্ছে তা নয় চৌধুরী, আসলে ভাল লাগছে এই ভেবে যে ফরেন্সিক বিজ্ঞানের কাছে মহিউলের হীন ষড়যন্ত্র নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। তুমি সেদিন বলছিলে ফরেন্সিকের কাজ হল খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান। —অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা। —কিন্তু শুধু তাই নয় চৌধুরী। ফরেন্সিকের কাজ, যাঁরা অসহায়, নির্দোষ, নিরপরাধ তাঁদের রক্ষা করা।

নাথিং ক্যান্ এস্কেপ, ফরেন্সিক!

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে যে সব দানে পূর্ণ করেছে, ফরেন্সিক তারই একটা, যার আলোকে মানুষের বোধ, তার বিবেক হয়েছে পূর্ণ, হয়তো বা ধন্যও।





—দো আঁখে, অউর এক মন।

বন্ধুবর আমার কথাটা কিন্তু সহজ মনে মেনে নিতে পারল না। হাত নেড়ে বলল,

—তাহলে তো সব জটিল সমস্যাগুলোই মিটে যেত। এত কষ্ট করে পুলিশী তদন্ত, শিক্ষিত কুকুরের দল কিছুরই দরকার হত না। ঐ দুটো জিনিস তো সব তদন্তকারীরই আছে।

সমর্থনসূচক ভাবে মাথা নেড়ে বললাম,

—হ্যাঁ আছে। এবং তা কাজে লাগানো হচ্ছে বলেই তো তুমি আমি এখনও নিরুপদ্রবে সমাজে বাস করছি। তা না হলে তো গোটা সমাজ চোর, ডাকাত, খুনে, বদমাইশে ভরে যেত। তাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের পর পারে চলে যেতে হত। কিন্তু তা হয়নি—তা হয় না। তাই সেই বীভৎস খুনের নায়ক 'শংকর লাল'কে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে, 'হাওড়ার বন্ধ ট্রাঙ্ক'—এর ষড়যন্ত্র-কারীকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, 'ওঁকারনাথ সিং'-এর হত্যাকারী আইনকে ফাঁকি দিতে পারল না—তার শাস্তি হয়েছে। দিব্যেন্দু তার বড় ভাই পূর্ণেন্দুবাবুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে পারল কি নিজেকে বাঁচাতে? এসব বীভৎস রোমাঞ্চকর হত্যা ও তদন্তের কাহিনী তো এর আগেই লিখেছি। আসল কথাটা কি জানো?

বন্ধুবরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল।

—সেটাই তুমি মানতে চাইছ না—ঐ—'দো আঁখে আউর এক মন'। দুটি বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি আর একটি আত্মবিশ্বাসী সুদৃঢ় সবল মনের একাগ্রতা।

কিন্তু বন্ধুবর তখনও না মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে লাগল। তারপর একটু থেমে বলল,

—তা কি করে হবে? তুমি যতই সহজ করে বলার চেষ্টা কর না কেন, তা হয় না।

—কেন?

—তাহলে, তুমি কি বলতে চাইছ যারা 'ক্রাইম' করছে, তারা সব সময়েই তোমাদের চেয়ে সব বিষয়ে 'ইন্‌ফিরিয়র'? এটা তো নাটক নভেলেই দেখা যায়। কিন্তু সমাজে তা হয় না, বাস্তবে ঐ যুক্তি তো খাটে না—খাটানো উচিত নয়। ব্যাপারটা কি অতই হালকা—অতই সহজ?

বুঝলুম, বন্ধুবরের কথাগুলো উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবার মতো

নয়। তাই গলার স্বরে আরো গুরুত্বের ভাব এনে আলোচনা বেশ কিছুটা জমিয়ে তোলার ভঙ্গিতে বললাম,

—ব্যাপারটা সহজ নয়, হাল্কা করে ভাবার মতো তো নয়ই। খুনীকে দুর্বল, বুদ্ধিহীন, অশিক্ষিত ভেবে নেওয়া, বিশেষ করে তদন্তের শুরুতেই, কোন অপরাধ-বিজ্ঞানীর মোটেই উচিত নয়—এ বিষয়ে সব সময়েই আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু তুমি যদি কোন অপরাধ বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ অভিমত পড়, তাহলে দেখবে মানুষ যখন কোন মারাত্মক অন্যায় বা 'হিনীয়াস ক্রাইম' করে, বিশেষ করে মার্ডার অর্থাৎ খুন—তখন তার আচরণ বা 'বিহেভিয়র' পরীক্ষা করতে হয়, কারণ খুন করার আগে দেহে বা মনে মানুষটি সাধারণ ভাবে ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত থাকে। এবং সেই উত্তেজনার মধ্যেই সে তার খুনের 'ছক' বা 'স্কীম'টা তৈরি করে। আর ঐ সঙ্গে আরো দুটো জিনিস সে মনে রাখে।

—জিনিস দুটো কি ?

—'সেল্‌ফ্' আর 'এভিডেন্স'—হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছে,'সেল্‌ফ্ -অর্থাৎ, খুনী ঐ খুনের সময়ে নিজেকে অপরের লক্ষ্য থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। দ্বিতীয়, সে সজাগ থাকার চেষ্টা করে—অপরাধের কোন তথ্য বা সূত্র যেন কোথাও ছড়ানো না থাকে। অপরাধ সংঘটিত হবার পর উত্তেজনা ছাড়াও তার মনে এসে ভিড় করে আরো একটি জিনিস। কী সেটা ?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্থির ভাবে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল বন্ধুবর—।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আমিই শুরু করলুম,

—তা হচ্ছে ভয়। ভয় থেকে আতঙ্ক যাকে বলে, 'ফীয়ার অ্যাণ্ড টেরার'। তখন তার মন আর স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে না। এই জন্যে দেখবে, খুনের ঠিক অল্প সময়ের মধ্যে জবানবন্দী নিতে পারলে আসল হত্যাকারী অনেক সময় এলোমেলো অবান্তর

অসংলগ্ন কথা বলে ফেলে। ফলে, রহস্য ভেদের পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে। এ-সম্বন্ধে তোমাকে বলব একদিন কি ভাবে সম্পূর্ণ অজানা এক পথচারীর একটি অতর্কিত উক্তি কেমন করে, একটি ভয়াবহ খুনের মূল সূত্র ধরে ফেলতে সাহায্য করেছিল।

এতক্ষণ বন্ধুবর চুপ করে শুনছিল। সহাস্যে বলল,

—কিন্তু যেখানে তুমি হত্যার পর খুনাকে পাচ্ছ না, সেখানে কি করে তার 'আচরণ' পরীক্ষা করবে? কি করে জবানবন্দী নেবে? --যেটা না কি বেশীর ভাগ খুনের পরই হয়ে থাকে।

—সেখানেই তো ঐ—'দো আঁখে অউর এক মন'। এর ওপর আছে ভালো ভাবে—'হত্যার স্থান পরীক্ষা'। 'ক্রিমিনোলজি'র ভাষায় যাকে বলা হয় 'অন দি স্পট্ এন্‌কোয়্যারী'। এর পর খুনীর সাক্ষাৎ এক সময় নিশ্চয় মিলবে এবং তখন ঐ 'বিহেভিয়র' অর্থাৎ খুনীর আচরণ পরীক্ষা। তাহলে শোন—একটা গল্প বলি।

—শ্রাবণ মাস। সারা দিন বৃষ্টি পড়ছে। বিকেল সাড়ে চারটের সময়ই রাস্তা ঘাট অন্ধকার হয়ে এল। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোগুলো জ্বলে উঠল।

লোকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে বাড়ির পথে। হেড্‌লাইট জ্বেলে মোটর গাড়ি চলছে। বাসে ট্রামে অসম্ভব রকমের ভিড়।

রাস্তায় লোকজন দ্রুত কমে আসছে।

শহরের বিখ্যাত এক রাস্তার ওপর মনিলালের মনিহারী দোকান।

সেদিন সে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই দোকানে তালা বন্ধ করে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে একটা বড় থলে ঝুলিয়ে সাইকেল চড়ে বাড়ির উদ্দেশে চলল।

তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

বাড়িতে ছেলের অসুখ। ডাক্তার আনতে হবে।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ আনমনা ভাবেই একটা ছোট্ট গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। আশপাশে কোথাও লোকজন নেই। গলিটা দিয়ে গেলে একটু তাড়াতাড়ি হয়।

বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে অনেক পথ ভাঙতে হয়। কিন্তু তবুও গলি দিয়ে যায় না সে। কারণ পথটা নির্জন। এছাড়াও গুণ্ডার উৎপাত আছে।

ছেলের অসুখ বলে সেদিন মনটা বড় অস্থির, ব্যতিব্যস্ত ছিল তার।

তাই কোন চিন্তা ভাবনা না করেই সে জোরে সাইকেল চালিয়ে গলির পথটুকু পেরিয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু বিধাতা বিমুখ।

গলির মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ একটা লাঠি মাথায় এসে পড়ল। মনিলাল সামলে নেবার আগেই আবার। তিন জন গুণ্ডা তিন দিক থেকে মারতে লাগল।

সাইকেল ফেলে রেখে মনিলাল পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু একজন ছুটে এসে জামাটা চেপে ধরল। তারপর বুক পকেট থেকে যে একশ তেইশ টাকা ছিল, জোর করে তা ছিনিয়ে নিল।

ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি, জাপ্টাজাপ্টি।

মনিলাল একটা লোকের মুখে সজোরে একটা ঘুসি মেরে প্রাণ ভয়ে দৌড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

ভারী আর বিরাট লাঠির ঘায়ে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বিকট চিৎকার করে উঠল,

—কে আছ—বাঁচাও—বাঁচাও! মেরে ফেললো—বাঁচাও।

সারা গলিতে হৈ হৈ পড়ে গেল। আর্তনাদ শুনে আশপাশের বাড়ির লোক জন দরজা খুলে ছুটে এল। অনেকের হাতে লোহার ডাণ্ডা, লাঠি।

কিন্তু তাদের কিছু বলবার আগেই যন্ত্রণায় [illegible] মণিলাল অজ্ঞান হয়ে গেল।

গুণ্ডারা অতর্কিতে এত লোকের সমাগম ঠিক আশা করেনি। হাজার হলেও ভয়ে তাদের মনটা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল ছিল।

তাই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র বেগে সাইকেলে চড়ে পালাল। তার দেখাদেখি আর একজনও দৌড়ল।

আর শেষ লোকটি সামনে যে সাইকেলটা পেল তাতে চড়েই পালাল। তার নিজের সাইকেলটা পড়ে রইল মাটিতে। নিয়ে গেল মনিলালের সাইকেল।

অল্প অন্ধকার আর লোকজনের মারমুখী চিৎকারে তারা এই মারাত্মক ভুলটা করে গেল।

বন্ধুবর বিস্মিত হয়েই বলল,

—নিজের মৃত্যুবাণ কর্ণের মতো অপরের হাতে গচ্ছিত রেখে গেল বলছ?

— ঠিক তাই—তা না হলে কারো সাধ্য ছিল না ওদের ধরতে পারে।

এদিকে কালো পুলিশ ভ্যান ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল।

ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স।

মনিলালকে হাসপাতালে পাঠালেন পুলিশ অফিসার।

তারপর নিয়ম মাফিক রাস্তার ওপর পড়ে থাকা চাপ চাপ রক্ত সংগ্রহ করলেন তিনি।

পড়ে থাকা সাইকেলটা তুলে একজন কনষ্টেব্‌ল্‌ বড় কালো ভ্যানের মধ্যে রাখল। জল-কাদা আর রক্তমাখা সাইকেল।

সব কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যেই ওঁরা চলে গেলেন।

একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেল, যাঁরা ভিড় করেছিলেন রাস্তায়, তাঁরা সবাই রাস্তার রক্ত যাতে কারো পায়ের চাপে নষ্ট না হয় তার দিকে নজর রেখেছিলেন।

এ সত্যি, এ বিষয়ে জনসাধারণের বেশ খানিকটা সজাগথা কা উচিত। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বা পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত তাঁরা যেন ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা চিহ্নগুলো সযত্নে রক্ষা করেন। কারণ তাতে তদন্তের সুবিধে হয়।

আসামীরা নিজেদের কোন না কোন চিহ্ন ফেলে রেখে যাবে এটাই সাধারণ নিয়ম, অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না।

কর্মব্যস্ত ফরেন্সিক লেবরেটারীতে তখন ছুটি হয় হয়। পুলিশ অফিসারের কাছে সব শুনে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ তখনই সাইকেলটা পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন।

নানাভাবে পরীক্ষা চলল। কাদা ধুয়ে, নানান্ পদ্ধতিতে চেষ্টা চলতে থাকল একটা কিছু বের করার। হয় কোন নম্বর, না হয় দোকানের নাম।

বা যাহোক কিছু একটা, যেটাকে কেন্দ্র করে তদন্তের ছক তৈরী করা যাবে।

বড় বড় আলো নিয়ে পরীক্ষকরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কর্তব্য কর্মে ব্যস্ত হলেন। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা চলল।

এদিকে হাতে সময় অল্প।

কারণ আমরা জানি যে, এ ধরণের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তদন্ত আরম্ভ করতে না পারলে অপরাধীকে ধরা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

পনেরো মিনিট পরিশ্রমের পর পিছনের চাকার মাড্ গার্ডের নীচে এক কোণে তিনটি ইংরাজি অক্ষর পাওয়া গেল।

কষ্ট করে পড়া যায়—'সি. সি. সি.'। কিন্তু এটা কি হতে পারে? —দোকানের নাম ?—না ব্যক্তির নাম ?

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার চিন্তা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট পরে একজন অ্যানালিস্ট হঠাৎ বললেন,

—এখানে একটা নম্বর পাওয়া যাচ্ছে—'বাইশ'। অর্থাৎ 'সি. সি. সি.—২২'।

—এটা ভাড়া দেওয়া সাইকেল। আর ওটা দোকানের নামই হবে। বাইশ নম্বর সাইকেল। কিন্তু—কি নাম দোকানের ?

খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তা করে ইন্সপেক্টার বললেন,

—যে সব দোকান সাইকেল ভাড়া দেয় বা সাইকেল সারায়, তার মধ্যে বড় দোকান হচ্ছে—সেণ্ট্রাল সাইকেল কর্ণার। সেটা শহরের দক্ষিণ দিকে—আর ঘটনাটাও ঘটেছে শহরের দক্ষিণে।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বললেন,

—তাহলে ওখানেই চলে যান। দেখে আসুন, খোঁজ খবর নিন।

—হ্যাঁ স্যার। ওখানেই খোঁজ করে দেখি। তার আগে হাসপাতাল হয়ে যাব। ভদ্রলোক বেঁচে আছেন কি না কে জানে ?

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অফিসার হাসপাতালে এলেন।

ভদ্রলোকের স্টেটমেণ্ট নিলেন। ভদ্রলোকের নাম—মণিলাল শীল।

যা যা ঘটেছিল সবই বলল মণিলাল। কতকগুলো দামী কথাও সে জানাল,

—তিনজন গুণ্ডার মধ্যে একজন দেখতে খুব লম্বা। একজনের ডান ভ্রূ কেটে গেছে ওর ঘুঁসিতে। অপর একজনের হাল্কা নীল শার্ট। তার ডান কানটা কেমন যেন বড় মনে হয়েছে মণিলালের।

এ ছাড়া, টাকা চুরি যাওয়ার কথা, বড় থলিতে চারটে সাবান, দোকানের হিসাবের খাতা—ছেলের জন্য ছ'খানা বিস্কুট ইত্যাদি যা যা ছিল,—সবই বলল মণিলাল। আরো জানালো, তারা ওর যে সাইকেলটা নিয়ে গেছে তার হাতলটা সবুজ প্লাস্টিকে মোড়া। সিটটাও তাই।

ডাক্তার বললেন,

—মণিলালের আঘাত খুবই গুরুতর, তবে জীবন হানির সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

বড় রাস্তাটা পেছনে ফেলে পুলিশ জীপ পূব মুখো একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকে গেল।

দু-ধারে সারি সারি ঝলমলে আলোজ্বালা বাইরে জিনিষ সাজানো নানা ধরণের নানা দোকান। ধীরে ধীরে রাস্তার ধার ঘেঁসে—একটা দোকানের সামনে পুলিশ জীপ দাঁড়াল।

পুরোন সাইকেল মেরামত করা হয় এ দোকানে। দোকানের ভেতরে বেশ ভিড়।

পুলিশ অফিসার দোকানের সাইন্ বোর্ডটা মুখ তুলে দেখে নিলেন। সেই—সেণ্ট্রাল সাইকেল কর্ণার। সি-সি-সি।

খুসি মনে অফিসার ভেতরে এসে ঢুকলেন। দোকানের ালিক শঙ্কিত হয়ে ভাঙ্গা সাইকেল মেরামতির কাজ ছেড়ে উঠে এল। তার পর কুণ্ঠিতভাবে আমতা আমতা করে বলল,

—কিছু বলবেন স্যার ?

—হ্যাঁ।

পুলিশ অফিসার গম্ভীর স্বরে বললেন। মুখ শুকিয়ে গেল দোকানের মালিকের। অভ্যর্থনা জানাতে চাইল আগে,

—বসুন স্যার, আগে বসুন।

যারা ভিড় করে এসেছিল তাদের সরিয়ে দিতে চাইল দোকানের মালিক,

—এই তোরা যা, ভিড় করিস্‌নি।

উপস্থিত কৌতূহলীদের পুলিশ অফিসারও বললেন,

—হ্যাঁ আপনারা বাইরে যান।

অফিসারের অনুরোধে সবাই চলে গেল।

—এ দোকান তোমার ?

ভয়ে ভয়ে সাইকেল ওয়ালা বলল,

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমার নাম রবি।—কিছু বলার থাকলে আমাকেই বলতে পারেন।

– তুমিই দোকানে সাইকেল সারাও—? ভাঙ্গা সাইকেল মেরামত করো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—।

—সাইকেল ভাড়া দাও ?

কড়া গলার আওয়াজে চমকে উঠল রবি। শুষ্ক কণ্ঠে বলল,

—আজ্ঞে—?

পুলিশ অফিসার ভ্রূ কুঁচকে আবার বললেন,

—বলছি, সাইকেল ভাড়া দাও খদ্দেরকে ?

এবার সাইকেল ওয়ালা মারাত্মক ভয় পেল। নিমেষে মুখ খানা বিবর্ণ হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল,—

—আজ্ঞে মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি, স্যার।

—আজ দিয়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালে তিন খানা গেছে।

—কত নম্বরের সাইকেল ?—খাতা আছে ? —নাম লিখে রাখ না—?

—আজ্ঞে লেখাপড়া শিখিনি স্যার—তাই খাতা রাখি না। মানে, রাখতে পারি না স্যার। টিনের চাকতি আছে, তাতে বুঝি কোন্ কোন্ গাড়ি বাইরে যাচ্ছে। —এই দেখুন না স্যার—।

সাইকেল ওয়ালা ময়লা ন্যাকড়া মোড়া কতকগুলো লোহার চাকতি বের করে অফিসারের সামনে ধরল।

—মোট আটটা চাকতি, স্যার। আটটা গাড়ি ভাড়া গেছে।

— বাইশ নম্বর সাইকেল গেছে বাইরে—?

একে একে চাকতিগুলোর নম্বর পড়ে সাইকেল ওয়ালা বলল,

—হ্যাঁ—বাইরে গেছে—। এখুনি ফিরবে।

—কে নিয়েছে বাইশ নম্বর সাইকেল—? কি নাম তার?

—দত্ত বাড়ির ছেলে বিল্টু—। খুব ভাল সাইকেল স্যার। এখুনি ফেরত দেবে দেখবেন। সাইকেলটা পুরোনো বটে তবে—

পুলিশ অফিসার দৃঢ় স্বরে বললেন

– কোথায় থাকে তোমার এই বিল্টু দত্ত?

-- আজ্ঞে হরি দত্ত লেনে—তিন নম্বর বাড়ি। কেন স্যার?

সাইকেলওয়ালার বুকটা ধক্ করে উঠলো।

পুলিশ অফিসার কথার জবাব না দিয়ে বললেন,

—আমি ওর বাড়ি যাচ্ছি—। যদি এর মধ্যে বিল্টু আসে, তো ধরে রাখবে। যেন পালাতে না পারে—নইলে তুমি বিপদে পড়বে, সাবধান।

সে স্যার—নিশ্চিন্ত থাকতে পাবেন—। আমি ধরে রাখব। ছেলেটা দিন দিন বকে যাচ্ছে স্যার—' বুঝেছি, কোন কী। বাধিয়ে এসেছে। তা না হলে আপনি স্যার-।

কথাটা শেষ হবার আগেই দ্রুত গতিতে অফিসার দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জীপে উঠে বসে স্টার্ট দেবার আগেই রোগা, ময়লা, বছর আষ্টেকের একটি ছোট্ট ছেলেকে ধরে এনে গাড়ির সামনে দাঁড় করাল সাইকেল ওয়ালা। বিরক্তি ভরে চীৎকার করে উঠলেন অফিসার,

—এখন সরে যাও—ইডিয়েট্—।

সাইকেল ওয়ালা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ম্লান হেসে বলল,

—এই সেই বিল্টু—স্যার, এইমাত্র এল। —ধরে আনলুম।

অফিসার বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এসে বিল্টুকে ধরে বললেন,

—তুমি? তোমার নাম বিল্টু—? তোমার সাইকেল?

ছেলেটি প্রথমটা থতমত খেয়ে সরু গলায় বলল,

—ঐ তো—ওখানে ফেরৎ দিয়েছি। বাইশ নম্বর সাইকেল।

তারপর সাহস করে বলল,

—রবিদা, দাও না ওঁকে সাইকেলটা।

—হতভাগা, কোথায় ছিলি—? বিকেলে গাড়ী ফেরত দিবি তো? সাইকেল ওয়ালা ধমকে উঠল বিন্টুকে,

—এই জন্যে তোদের দিই না।

পুলিশ অফিসার জীপে উঠে সাইকেল ওয়ালার দিকে চেয়ে বললেন,

– আশেপাশে আর কোন সাইকেল ভাড়া দেওয়ার দোকান আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় রাস্তার ওধারে ক্ষেত্রমোহন সাইকেল রিপেয়ারিং শপ—। গঙ্গার ধারে—মধু হাজরার দোকান, তবে সে সাইকেল ভাড়া দেবে না।

— আর—?

ভেতরে ভেতরে পুলিশ অফিসার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—আর—বকুলতলায় বিমল কর্মকারের 'সারভিসিং স্টোর্স'।

পুলিশ অফিসার এবার জিজ্ঞেস করলেন,

—তিনটে 'সি' দিয়ে কোন দোকানের নাম বলতে পারো, যেখানে সাইকেল ভাড়া দেয়?—তোমার দোকানের নামের মতন।—সি. সি. সি। ভেবে বল—। ধোঁকা দেবার চেষ্টা করো না বলছি—যদি জানো তো বলো।

সাইকেল-ওয়ালা অনেক চিন্তা করে বলল,

—চলে যান স্যার—উত্তর কলকাতায় কাশী মিত্তির ঘাটের রাস্তায় বড় দোকান, নাম—সেন্ট্রাল সাইকেল সেন্টার। ওরা আরও খোঁজ দিতে পারবে। দক্ষিণ কলকাতায় ও নামে আর দোকান নেই স্যার—। আজ কাল গাড়ি ভাড়া কেউ—।

ইঞ্জিন স্টার্টের শব্দে বাকি কথাগুলো চাপা পড়ে গেল। উদ্ধার

বেগে পুলিশ জীপ ছুটল উত্তর কলকাতা। হাতে আর মোটেই সময় নেই।

তার ওপর এতখানি সময় বৃথাই নষ্ট হল।

বর্ষার জন বিরল রাস্তা পেছনে ফেলে চিন্তামগ্ন পুলিশ অফিসার জীপের স্পীড্ বাড়াতে লাগলেন। বৃষ্টিটা যে কোন মুহূর্ত্তেই আসতে পারে। ঘন ঘন মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে।

পুলিশ জীপ থামল।

ট্র্যাফিক সিগ্ন্যাল।

রাস্তার দু-ধারের ছোট ছোট দোকানপাট সবই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোলো হাওয়া বইছে।

হাতঘড়িটায় সময় দেখে নিলেন অফিসার। মনে মনে হতাশ হলেন।

রাস্তার লাল আলো সবুজ হল। পুলিশ অফিসার চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চীৎপুর এলাকায় ঢুকে পড়লেন।....

মিনিট দশ পরে জীপ গাড়ি ঢুকল কাশী মিত্র ঘাট রোড।

কিন্তু কোথায় দোকান? তবে কি সাইকেল-ওয়ালা মিথ্যে বলল? জীপের গতি থামিয়ে ধীরে ধীরে চলাতে লাগলেন অফিসার।

হঠাৎ একটা ছোট্ট দোকানের ওপর দৃষ্টি পড়লো তার।

সাইকেলের দোকান। পুরোনো সাইকেল দরজার গায়ে ঠেসান দেওয়া রয়েছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালেন অফিসার।

নোংরা সাইন বোর্ড। নাম ভাল পড়া যায় না। অত্যন্ত অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব্ জ্বলছে। তবে সাইন বোর্ডের সব জায়গাটাতে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য নেই তার।

অনেক কষ্ট করে পুলিশ অফিসার দোকানের নামটা পড়লেন। —সেণ্ট্রাল সাইকেল সেণ্টার। সাইকেল সারানো হয়, ভাড়াও দেওয়া হয়।

পুলিশ অফিসার ভেতরে এসে প্রশ্ন করলেন,

—বাইশ নম্বর সাইকেল কে ভাড়া নিয়েছে ?—কবে ?

প্রশ্নটা বিনা ভূমিকাতেই করলেন পুলিশ অফিসার। গলার আওয়াজটা গুরু গম্ভীর।

একে পুলিশ, তায় ঐ গলা। আঁতকে ওঠারই কথা দোকানের মালিকের— 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'—কথায় আছে।

তাড়াতাড়ি বড় একটা খাতা বের করে দেখে ভয়ে ভয়ে বলল,

—স্যার—বাইশ নম্বরটা গেছে—এই তো গত কাল—। নিয়েছে ঐ লম্বোদর মিত্তির। ঐ তো মিত্তির বাড়ির লম্বা ছেলেটা। ঐ—ঐ তো স্যার, বারো নম্বর বাড়িটা। স্যার—ধরুন না,—ধরুন, শালা গুণ্ডা—। এখানে সাইকেল ভাড়া নেয় স্যার, পয়সা দেয় না—। গায়ের জোর দেখায়। বরেন মিত্তিরের ছেলে।

যেন নিজেকে বাঁচাতে অনেক কিছুই বলে চলল সাইকেল দোকানের মালিক।—আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কিন্তু ইন্সপেক্টর আর দেরী করতে পারেন না। হাতে সময় নেই। এগুনি খুঁজে বের করতে হবে লম্বোদর মিত্রকে।

দ্রুতপদে পুলিশ অফিসার এলেন বারো নম্বরে বরেন মিত্রের বাড়ি।

বরেন মিত্রকে পাড়ায় সবাই চেনে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথাগুলো শুনে পুলিশ অফিসারের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,

—অন্য কেউ এ কথা বললে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তাকে চাবকে ঠাণ্ডা করে দিতুম। কিন্তু ইন্সপেক্টার, আপনি যখন বলছেন তখন মনে হচ্ছে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। আমার ছেলে গুণ্ডা? না—না, অসম্ভব। ভুল শুনেছেন আপনি। সে বেকার হতে পারে—চোর নয়।

ইন্সপেক্টারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

—কিন্তু আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর পেলুম না বরেন বাবু! কোথায় সে? বাড়িতে আছে কি নেই—সে কথাটা কি জানেন?

—জানি। এ সময়ে ওর বয়সী ছেলেরা কেউ কি বাড়ি থাকে?

—এটা বৃষ্টি-বাদলের দিন। সৎ প্রকৃতির ছেলেরা নিশ্চয়ই বাড়ীতে থাকে—।

—আমার ছেলে অসৎ গুণ্ডা, এ কথাই বলতে চান তো? জানেন, সে এম্. কম্. পাশ? অনেক কষ্ট করে তাকে পড়িয়েছি। সে গুণ্ডা বদমাইশ হলে পড়াশুনো কী করতে করেছে?

ইন্সপেক্টার অবাক হয়ে বললেন,

—এম্. কম্ পাশ—! কিন্তু তার এমন বদনাম কেন? সে তো পাড়ায় গুণ্ডা বলে পরিচিত। তার বন্ধু বান্ধব কাউকে চেনেন? কি রকম ধরণের ছেলে তারা?

—চিনি—। ঐ হালদার বাড়ির পদা আর সরকার-বাড়ির ভান কানটা বড় ঐ হেমন্ত, তাকে পাড়ার সবাই বলে—'কান বড়ো হেমা'। —দু'জনেই গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু ঐ একই অবস্থা—বেকার। বাপের অন্ন ধ্বংস করছে। আপনারা এক-আধটা চাকরি ওদের করে দিতে পারেন না মশাই? ইয়ং ম্যান ওরা, এখন করেই বা কি? সারা দিন কাজ নেই, কম্মো নেই—শুধু বসে থাকা।

—কেন? ভালো ভালো কাজই তো ওরা করে বরেনবাবু! দল বেঁধে চুরি করে, ডাকাতি করে। নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় লাঠি মারে। সারা দিন ধরে কত কাজ ওদের—আর আপনি বলছেন কি না ওরা বেকার—বসে আছে!

ইন্সপেক্টারের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মর্মে মর্মে অনুভব করলেন বরেনবাবু। তবুও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

—আমার ছেলে ও রকম নয়। হতে পারে না—ইমপসিবল্।

অন্তত আমার জানা নেই অফিসার। আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন। যদি অন্যায় করে থাকে তবে শাস্তি সে পাবেই। আমার কি?

—ও—।

আর কিছু না বলে বাড়ির বাইরে চলে এলেন ইন্সপেক্টার।

কিন্তু কোথায় থাকে পদা আর হেমা?

বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

রাস্তার অপর ফুটপাতে একটি বাড়ির ঢাকা দেওয়া রকে দুটি ছেলে বসেছিল। পুলিশ দেখে একজন উঠে দাঁড়াল।

ইন্সপেক্টার দৌড়ে এ পারে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

—সরকার-বাড়ির হেমন্ত কোথায় কোন বাড়িতে থাকে ভাই?

—ঐ তো, মোড়ের বাড়িটাই তো ওদের। কেন বলুন তো স্যার?

—এমনি খুঁজছি।—ঐ বাড়ি?

—হ্যা—একটু দাঁড়ান। কিন্তু ওরা তো নেই।

—ওরা—? মানে, ওরা—কারা?

—ঐ তো—লক্ষ্মদা, হেমাদা আর পদাদা—ওরা কেউ নেই। সাইকেল করে চন্দননগর গেছে—কাল ফিরবে।

—তাহলেও যাই একবার। দেখি—যদি ফিরে থাকে—।

মোড়ের বাড়ি হলেও ঢোকার দরজাটা পাশের গলির মধ্যে। দরজা খোলাই ছিল। সামনে উঠোন।

দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে ভেতরে দেখলেন ইন্সপেক্টার।

এ কি!

সবুজ প্লাষ্টিক মোড়া হাতলওয়ালা সাইকেল দেওয়ালের কোণে ঠেস দেওয়া রয়েছে।

সিপাইদের ইঙ্গিতে কাছে ডেকে ইন্সপেক্টার এবার সজোরে কড়া নাড়লেন।

দ্রুত পদে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে হঠাৎ পুলিশ দেখে আঁতকে উঠে ভেতরে পালাতে গেল।

কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে অফিসার ছুটে গিয়ে ঝাপটে ধরলেন তাকে।

এ যে সেই কান বড়ে' হেমা! হেমন্ত সরকার,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।—পরণে গামছা, এলো গা।

কোথায় গেল তার গায়ের জামা, গেঞ্জি, প্যাণ্ট—?

চিন্তা করলেন অফিসার। সেগুলো নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

দেখতে দেখতে পুলিশ সরকার বাড়ি ঘিরে ফেলল। পাড়ার লোক প্রায় সকলেই ভেঙে এল।

বাড়ি সার্চ করে প্যাণ্ট, রক্ত মাখা হালকা নীল রঙের শার্ট আর তার সঙ্গে সাদা গেঞ্জিটাও পাওয়া গেল। একটা রক্তমাখা বড় থলি ভাঁড়ার ঘরের একটা কোণে লুকোনো ছিল।—মণিলালের থলি। ভেতরের কোন জিনিস তখনও সরানো হয়নি। হয়তো সময় পায়নি হেমন্ত।

সন্ধ্যের সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই পাড়ার সহস্র লোককে হত চকিত করে পুলিশ অফিসার ভদ্র ঘরের সুশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ছেলেটিকে জামার কলার ধরে কালো ভ্যানে তুলে নিলেন।

এর পর অঝোর ধারে বৃষ্টির মধ্যে ভোর রাত্রিতে অতর্কিতে মিস্তির-বাড়ি ঘেরাও করে কৌশলে গ্রেপ্তার করা হল ঘুমন্ত লম্বোদরকেও।

কিন্তু পাওয়া গেল না পদ্মরাম হালদারকে। সে অ্যাব্‌স্‌কণ্ডার্‌—পলাতক।

পরের দিন পাড়ার বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক এদের দু'জনের বিরুদ্ধে স্টেট্‌মেণ্ট্‌ দিলেন।

কেউ বললেন, গুণ্ডা। কেউ বললেন, 'টেরার'। —শয়তান।—লম্পট।

আবার দু-চার জন বললেন,

—এরা স্যার অদ্ভুত। এরা লোকের মাথায় লাঠি মারে, আবার কাঁধে তুলে হাসপাতালেও ভর্তি করে দিয়ে আসে। এরা ঠিক গুণ্ডা নয় ইন্সপেক্টরবাবু, এরা সব 'মিস্‌গাইডেড্'—মানে জীবনে চলার পথে বিভ্রান্ত। কিছুটা হয়তো আক্রোশেই করে এই সব।

পুলিশ অফিসার যথা রীতি ৩৯৫।৩৯৭ ধারাতে কেস লিখলেন।

এ ছাড়া আলাদা আলাদা 'এক্‌জিবিট্' 'কারেন্সীজ্' করা মালগুলো পরীক্ষার জন্যে ফরেনসিকে পাঠালেন। মণিলালের রক্তও শিশিতে করে লেবরেটারিতে পাঠানো হল।

দু'জন আসামীর শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্টের রক্ত, আহত মণিলালের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলল। দু'জনের পায়ের তলায়, নখের কোণে আর হাতের আঙুলেও রক্ত পাওয়া গেল। তবে পরীক্ষাতে সেগুলো শুধু হিউম্যান ব্লাড্ অর্থাৎ মানুষের রক্ত বলেই বোঝা গেল। 'গ্রুপ' করা গেল না। রাস্তার রক্ত ও সেই লাঠি তিনটের রক্ত মণিলালের রক্তের গ্রুপের সঙ্গেও এক প্রমাণিত হল। ঐ লাঠি দিয়েই মণিলালকে মারা হয়েছিল।

লম্বোদরের প্যান্টের গোপন পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া গেল। আর রক্ত মাখা চল্লিশটা টাকা!

মনিলাল ঠিক যতগুলো বিস্কুট আর সাবান তার ব্যাগে ছিল বলে জানিয়েছিল, সবই পাওয়া গেল।

কেবল তিরাশী টাকার হিসেব মিলল না, কারণ পদ্ম হালদারের সন্ধান কেউ বলতে পারল না। আদালত তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,

—সে কি! পদ্মের খোঁজ পেলে না? এই সব গুণ্ডাদের যদি

ধরতে না পারে তাহলে সমাজ-সংসারে বাস করা যাবে কি করে? আচ্ছা, তারপর কোর্টে কি হল? জেল হল তো?

—হঁ্যা, বিচারে লম্বোদর মিত্র ও হেমন্ত সরকারের শাস্তি হয়ে গেল। কিন্তু—

বন্ধুবর আমায় থামতে দেখে অবাক হয়ে বলল,

—কিন্তু কি আবার? বেশ হয়েছে। ও সব গুণ্ডাদের চাবকে ছাল তোলা উচিত। এরাই সমাজের কলঙ্ক। লেখাপড়া শিখলে কি হবে আসলে এরা গুণ্ডা, এরাই—।

উত্তেজনায় কথাটা শেষ হল না তার।

সে ভাবটুকু লক্ষ্য করে বললাম,

—তুমি আমি এদের গুণ্ডা বলব ঠিকই—এরা গুণ্ডা, চোর, খুনে,—শুনলে অবাক হবে—আদালত সেদিন কিন্তু সে কথা বলতে পারেননি। সেদিনকার কোর্টের সেই মর্মান্তিক অনুভূতি আমার সমস্ত চিন্তাধারার মূলে একটা বিষম ধাক্কা দিয়েছিল। 'অপরাধ' কথাটার নতুন একটা অর্থ শিখলুম।

বন্ধুবর পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করল,

—কি রকম!

সামান্য একটু থেমে ম্লান হেসে বললাম,

—এ কথা তো তুমি মানবে যে, কোন মানুষই জন্ম থেকেই ক্রিমিন্যাল্ হয় না। তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে অপরাধী করে তোলে।

জীবনের সহজ, স্বাভাবিক চলার পথ যখন কোন এক কারণে বন্ধ হয়ে যায়, জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ে তখনই সেই জীবনটাতে দুর্নীতির, অপরাধের শ্যাওলা জমে ওঠে।

—লম্বোদর মিত্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিল। ভালো বক্তৃতা দিত, নাটক করত, আবৃত্তি করত, আবার সামনের কফি

হাউসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, রাজনীতি—সিনেমার গল্প সবই ওদের আলোচনার সাবজেক্ট ছিল।

কিন্তু বিধাতার কি নির্মম পরিহাস দেখ—জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল না লম্বোদর।

কত শত আপিসের দরজায় দরজায় ঘুরে পাতার পর পাতা শুধু দরখাস্তই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। সমাজ, সংসার তাকে কিছু দিল না।

চাকরি জুটল না তার।

সে পেল উপহাস, বিদ্রূপ, আত্মীয় পরিজনের ব্যঙ্গ! ভাবতে পারো, সুশ্রী সুন্দর একটি ছেলে ধীরে ধীরে কালো, বিবর্ণ হয়ে গেল। শুধু তার দেহের রঙই বদলাল না, সম্পূর্ণ বদলে গেল চোখের রংও। মনের সুন্দর সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোকে সে গলা টিপে মেরে ফেলল। তৈরী হল নতুন মানুষ। তার আশ পাশের দুনিয়ার ওপর হিংস্র আক্রোশ আর বাঁচার জন্যে টাকা রোজগারের বেপরোয়া প্রবৃত্তি মিলে মিশে গিয়ে এক দৃঢ় সংকল্পের জন্ম হল তার মধ্যে।

লম্বোদর মিত্র নয়, লম্বু মিত্তির,—পাড়ার গুণ্ডা,—টেরার। চোখে তার আগুন, শরীরে ইস্পাতের শক্তি।

সে কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে নেবে, সেও বাঁচতে চায়—এমনি করেই।

আদালত প্রশ্ন করলেন,

—লম্বোদর, এরা কি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছেন বলতে চাও? এঁরা বলছেন, তোমার ভয়ে এঁরা পাড়ায় টিঁকতে পারেন না। তুমি গুণ্ডা। কথাটা সত্যি?

লম্বোদর স্থির দৃষ্টিতে সাক্ষীদের দিকে চাইল। সবাইকেই সে চেনে।

হ্যাঁ, বেশ ভালোই চেনে। পাড়ার রমেন বসু। মহাজন সরকার। সুনীল বর্মন। রণদেব হালদার। এবং রমা বর্মন—সুনীল বর্মনের মেয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল লম্বোদর। তারপর বলল,

—রমেনবাবু, সরকার মশাই, বর্মন সাহেব ওঁরা সবাই ঠিক বলেছেন। সত্যি আমি গুণ্ডা—। তা ছাড়া আজ আর আমার কি পরিচয়? আমি মানুষের শত্রু। সমাজের কলঙ্ক। কিন্তু—

একটু থেমে লম্বোদর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,

—কিন্তু ঐ রমেনবাবুর মেয়ে হাসপাতালে যাবার দিন ট্যাক্সি পাচ্ছিল না। কোন ট্যাক্সি যেতে চাইছিল না। আমিই শেষে উপায় না দেখে জোর করে একটা ট্যাক্সিওয়ালার কলার চেপে ধরে তাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে বাধ্য করছিলুম। তাই মেয়েটি বেঁচে গেল। পাড়ার লোক বলেছিল,—বাবা লম্বু, তুই ওর প্রাণ দিলি। বেঁচে থাক্ বাবা—আধ ঘণ্টা দেরি হলেই মেয়েটা যন্ত্রণার ধাক্কায় মরে যেত।

—আর—ঐ মহাজনবাবুর মেয়ের লিউকিমিয়া হয়েছিল। আমিই মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের বলে-কয়ে অনেক কষ্টে ভর্তি করিয়েছিলুম সেদিন—। এই তো মাস-ছয় আগে। অবশ্য শর্মিলা বাঁচেনি—কিন্তু তার আমি কি করব? ওঁরা বললেন—গুণ্ডাব ছোঁয়া লেগেই মেয়েটা মরে গেল। কিন্তু শর্মিলা তো আমায় দাদা বলত, শ্রদ্ধা করত।

আবেগে গলাটা বুজে এল—তারপর লম্বোদর হঠাৎ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল।

মনে হল কান্নার বেগ সামলাচ্ছে লম্বোদর। তারপরে মুখ তুলে চোখ দুটো হাতের চেটোর উল্টো দিক দিয়ে মুছে নিয়ে বলল,

—থাক্ সে কথা! গুণ্ডার আবার মায়া, দয়া, ভালবাসা! ঐ রণদেব বাবুর সেজ ছেলে জ্যোতিষ—আমাদের বন্ধু,—যেদিন মারা গেল, জ্যোতিষের মা বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন।

কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি উপায় না দেখে পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে পড়ি। ধরে ফেলি তাঁকে। তা না হলে মাসীমাও মারা যেতেন সেদিন। গুণ্ডা না হলে পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠার মত সাহস আমার হল কি করে?

—ঐ যে, সুনীল বর্মন—বাঙালী সাহেব। কত সাহেবী কায়দা কানুন, বিলিতি চাল চলন। কিন্তু যেদিন রাত্রিবেলা—

স্থির ভাবে বর্মনের দিকে চেয়ে চিৎকার করে হঠাৎ থেমে গেল লম্বোদর।

সকলের দৃষ্টি পড়ল সুনীল বর্মনের ওপর। চমকে উঠে মাথা নীচু করল বর্মন সাহেব।

লম্বোদর বলল,

—সেদিন রাত্রে ওঁর পঁচিশ বছরের মেয়ে এষাদ একটা জোয়ান ষণ্ডা মার্কা পাঞ্জাবী ছেলে বন্ধু মদ খেয়ে এসে ওর ওপর হামলা করতে গিয়েছিল। সেদিন কার ডাক পড়েছিল? সেই রাত্রে কে ওঁর পরিবারের ইজ্জত বাঁচাতে হান্টার হাতে পদা আর হেনাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বর্মন সায়েবের বাড়ি? তারপর হান্টার পেটার শব্দ পাড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল।—হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে পাঞ্জাবীটা এষাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু আমার হাতের চাপে ওর ডান হাতের কব্জিটা চির দিনের জন্যে ভেঙে গেল। যাবার সময় ছেলেটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়েছিল মেয়েটাকে। প্রচুর টাকা নিয়েও মেয়েটা না কি কথা রাখেনি, তারই এই ফল। অস্বীকার করতে পারেন বর্মন সাহেব? পাড়ার লোক থানায় যায়নি। যে সেদিন তাঁর মেয়ের, স্ত্রীর শুধু ইজ্জত নয়, প্রাণ বাঁচাল, সে তো গুণ্ডা হবেই—নিশ্চয়ই গুণ্ডা। একশো বার গুণ্ডা। তা না হলে সেদিন রাত্রি বেলা সুনীল বর্মনের মেয়েকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সেই পাঞ্জাবীটার রিভলবার ধরা হাতটা সোজা ওপর দিকে তুলে ধরতে পারতাম কি? গুলিটা সোজা কড়ি কাঠে না লেগে বর্মন

সায়েবের মেয়ের কলিজার ভেতর ঢুকে যেত। মাতালটা এষা বর্মনকে খতম করে তবেই যেত সেদিন। সেই এষা বর্মনও আমার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষী দিতে আদালতে হাজির। চমৎকার!

--এই হচ্ছে ছুনিয়া।

দারুণ উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে লম্বোদর। সারা কোর্ট ঘর জুড়ে সে কী ভীষণ নিস্তব্ধতা। কেমন অসহায় অস্বস্তি।

আদালত এবার সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন,

—কিন্তু মিস্টার মিত্র, সমাজে তোমাদের আরো কত দায়িত্ব রয়েছে। তা পালন করছ না কেন? তাহলে তো এত গোলমাল থাকে না। দেশ সমাজ সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তো তোমাদেরও। সে দায়িত্ব পালন করা উচিত নয় কি তোমাদের?

লম্বোদর হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। ছু'চোখ থেকে ঠিকরে আগুন বেরিয়ে এলো। ক্ষোভের, যন্ত্রণার আগুন! কঠিন স্বরে বলল,

—আমাদের জন্যও সমাজ সংসারের তো দায়িত্ব রয়েছে -তা কি পালন করা হয়েছে?—না, হয়নি। করলে, বাবা আমাকে আইন পড়াতেন। রোজগার করে নিজের টাকায় পড়তে বলতেন না। দেশ আমার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়নি। আমি বেয়ারার চাকরির জন্যেও দরখাস্ত করেছি—পাইনি।--কিন্তু কেন? আমার কি যোগ্যতা নেই? তাই ঠিক করেছি, বাধ্য হয়েছি ঠিক করতে, জোর করে কেড়ে খাব। ঐ মনিলাল মুদিটা লুকিয়ে কালোবাজারে চাল বিক্রি করে বেশী দামে। তাই তার টাকা লুঠ করেছি। বাজে সস্তা সাবান দামী নাম-করা সাবানের প্যাকেটে মুড়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে পয়সা করেছে। বলুন—সে কি ভদ্র পোষাকের গুণ্ডা নয়? - ক্রিমিন্যাল্ নয়?—না, এরা সব সৎ। শুধু আমরাই বদমাইশ--। আমাদের শাস্তি হবে—জেল। .বশ, তাই হোক। এই বিচার, এই সমাজ,—এর প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, এর ভালোর, এর

মঙ্গলের জন্য কিসের মা! ব্যথা আমাদের? এই তো দুনিয়া—হায় ভগবান—

বিচারে লম্বোদর ও হেমন্তর সামান্যই শাস্তি হল।

কিন্তু সরকারের ব্যর্থ নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন আদালত। দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যাই যে এ সব অপরাধের অন্যতম কারণ—তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

বন্ধুবর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেল এই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল,

—আচ্ছা সেই গোপন চিঠিটার কি হল? পদ্ম হালদার? তার কি খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ, এবার সেই কথাই বলছি শোন। চিঠিটা থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস বের করল ফরেন্সিক। যার ফলে নাটকের শেষ অঙ্কটাও জানা হয়ে গেল।

লম্বোদর মিত্তিরের প্যান্টের ভেতর যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা পড়ে কোন কিছু বোঝা গেল না। অর্থাৎ সহজ ভাবে ঠিক যেমনটি লেখা ছিল সেটি পড়লে কোনই অর্থ হয় না। ধর লেখা ছিল—।

মকামল মদাঁকুনদা মানদম। মজাম মকরমব। মহেমাকে মডাকবিম। মলামঠি মনিবি বিনকেলে—মিতি মপদাম।

—কিছু বুঝলে? রবীন্দ্রনাথের ‘হংপ্তনের’ ‘পায়ে ধরে সাধা, ‘রা’ নাহি দেয় রাধা’—তার চেয়ে এটা কিন্তু অনেক সোজা।

—পাগলের প্রলাপ। ওরা কি মদ-টদ খায় না কি? মাতালের কথা।

—না, মোটেই নয়। সহজ, সরল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আমাদের আপিসের এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ‘উং-টা’ করে শব্দগুলো ব্যবহার করে কথা বলেন। যেমন,—লকা টিছু বনে,’ অর্থাৎ, কাল ছুটি নেব—

—উদ্দেশ্য, ঘরের আর কেউ যাতে বুঝতে না পারে যে, উনি

পরের দিন আপিসে আসছেন না—ডুব মারছেন। এটাও তাই। এই চিঠির লেখা থেকে যদি তুমি 'ম' অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কি দাঁড়ায় দেখ তো।

কাল বাঁকুড়া যাব। মজা করব। হেমাকে ডাকবি। লাঠি নিবি বিকেলে। ইতি পদ্ম।

বন্ধুবর অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—সে কি। এ যে রীতিমত ডাকাতি! তাহলে পদ্ম হালদার কোথায়, লম্বোদর জানত না বলছ—তোমরা সে কথা বিশ্বাস করলে কেন? ও নিশ্চয় জানত। ও মিথ্যেবাদী—লায়ার।

—না। ও মিথ্যেবাদী নয়। আদালতে লম্বোদর বলেছিল, সে গুণ্ডা, চোর, বদমাইশ হতে পারে। তবে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে জানে পদ্ম কোথায়। তবে বলবে না। কিছুতেই নয়।

কিন্তু তবুও ধরা পড়ল পদ্ম হালদার।

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন হালদার-বাড়ি।

পদ্মরামের বৃদ্ধা পিসিমা বললেন,

—বাঁকুড়ায় তো পদ্মর সেজ বোনের শ্বশুর বাড়ি। সেখানেই যাবে বলেছিল। হরি পাড়া—কালী মুকুজ্জের বাড়ি। ধান চাল বেচত, এখন মুদির দোকান করে। বড়লোক তো বটেই।

পুলিশ গেল বাঁকুড়ায়।

কালী মুকুজ্জে কিছুই জানতেন না।

পদ্মরাম হঠাৎ রেল গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চোখ ফাটিয়েছে তাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন তিনি। তাড়াতাড়িতে নিজের আসল নামটা ভুলে মধু হালদার বলে লিখিয়েছে পদ্ম। বাঁকুড়ার হাসপাতালে মধু ওরফে পদ্মর খোঁজ নিতে অসুবিধে হল না। এক চোখ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে পদ্ম।

—কেন? চোখ বাঁধা কেন—? পড়ে গিয়ে কি চোখে লেগেছিল?

—ন্ না।

—মনে আছে তোমার, মণিলাল বলেছিল, তার ঘুঁসিতে একজনের চোখের ভ্রূ কেটে গিয়েছিল। সেই ব্যক্তিই হচ্ছে এই পদ্ম হালদার। ট্রেন থেকে সে পড়ে যায়নি। মণিলালের হাতের আঙুলে আংটি ছিল। তাই চোটটা বিশেষ গুরুতর হয়ে পড়ে। মণিলালের ঘুঁসিতে পদ্ম হালদারের বাঁ চোখের কালো মণিটা গলে গিয়েছিল।

—গভীর রাত্রে হঠাৎ হাসপাতালে তারই বিছানার অদূরে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠেছিল পদ্ম। অপরাধ করে ফেলার পর থেকেই ওর মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে এসেছিল ভয়। ভয় থেকে—আতঙ্ক।

—পালাবার চেষ্টা করেনি? বন্ধুবর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল।

—তা কি আর না করেছিল—ধরা পড়ে যায়। ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হল।

মাস চারেক পরে পদ্মবাম সেরে গেল বটে, তবে সে তার বাঁ চোখটা হারাল। আদালতে তার শাস্তি কিছু কম হল।

মণিলালের বাকি টাকাটা আর উদ্ধার করা গেল না। পদ্ম স্বীকার করল, ও টাকাটা সে হাসপাতালে খরচ করে ফেলেছে।

আদালতে কালী বাবু বলেছিলেন চিকিৎসার জন্যে পদ্ম তাঁর হাতে আশী টাকা দিয়েছিল এ কথা সত্যি।

—তাহলেই দেখ,সজাগ দৃষ্টি আর একাগ্রতাই তদন্তের মূল কথা।

বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, মণিলাল বাবুর কি হল? বাঁচলেন তো?

—হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যথারীতি। কিন্তু—

—কি?

—শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছাড়ল না। দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে হাজির করল মণিলালকে।

—দুর্নীতি? সে আবার কী? কী দুর্নীতি মণিলালের?

—হ্যাঁ পদ্ম হালদার কোর্টে বলেছিল মণিলালের বাড়তি আঠাশ খানা বেনামী রেশন কার্ড আছে।

পুলিশ তদন্ত চালিয়ে সেই কার্ডগুলো বের করে। বিচারে মণিলালের ফাইন হল। বাড়তি কার্ডের চালগুলোই মণিলাল কালো বাজারে চড়া দামে বেচত।

এছাড়া বাজে সস্তা সাবান, দামী নাম-করা সাবানের খালি প্যাকেটে মুড়ে বাজারে বিক্রি করত মণিলাল। অবশ্য হাতে-নাতে সেটা ধরা গেল না। তাহলেও পুলিশের নজরে রয়ে গেল।

বন্ধুবর উত্তেজিত হয়ে বলল,

—এই মণিলালের দলই আসল 'ক্রিমিন্যাল্'—,কী বলো? তোমার কি মনে হয়—?

৭



প্রথম শ্রেণীর কামরাখানা শেষ পর্যন্ত আলাদা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল।

কলকাতায় আসছে ট্রেন।

স্টেশন মাস্টারের জরুরী তার পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছিলেন পুলিশ অফিসার—সঙ্গে জনা কয়েক কনস্টেবল্ নিয়ে।

তারবার্তায় লেখা ছিল—

- টু-ডাউন ট্রেণটার ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে একজন লোক খুন হয়েছে। অনুগ্রহ করে এসে হাসপাতালে নিয়ে যান ও প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নিন। ভদ্রলোকটির সামান্য জ্ঞান আছে। নাম বি. কে. সাউ—মার্চেণ্ট।

চেষ্টার কোন ক্রুটি করেননি অফিসার।

রক্তমাখা দেহটা তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠানো থেকে আরম্ভ করে কামরার ভেতরের যাবতীয় যা কিছু সবই সযত্নে সংগ্রহ করেছেন, খবরাখবর যাকে যা দেওয়ার সবই দিয়েছেন।

কামরা আলাদা করে নিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন রেল-কর্তৃপক্ষ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আশপাশের গ্রাম অঞ্চলে যাতে উত্তেজনা ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ভদ্রলোককে অফিসার নিজের গাড়িতেই পাঠালেন হাসপাতালে। তারপর কামরাটা বন্ধ করে তালার ওপর সীল দিয়ে অফিসার হেড্-কোয়ার্টার্সে টেলিফোন করলেন।

যথা সময়ে পুলিশের বড় কর্তারা এলেন।

তারবার্তায় অনুরোধ পাওয়া মাত্র এলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ, সঙ্গে ফটোগ্রাফার ও অন্যান্য অভিজ্ঞেরা। তাঁরা নিয়ে এলেন ক্রাইম-বক্স।

কামরা পরীক্ষা আরম্ভ হল।

বার্থের ওপরে, নীচে—রক্তের ছাপ ছাপ দাগ। একটা হোল্ডল, তার ভেতরে বিছানা, কাপড়-জামা।

বিশেষজ্ঞের নির্দেশ মত অনুসন্ধান করে জামা কাপড়ে ধোবি খানার চিহ্ন পাওয়া গেল।

ইংরিজি অক্ষর 'এল্'।

একটা রক্তমাখা হিন্দি ম্যাগাজিন, এক জোড়া চশমা, একটা রক্ত লাগা প্যাণ্ট, একটা খামে একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ। একটা হাতি মার্কা খাতা। মলাটে নাম লেখা—বি. কে. সাউ।

তাতেও রক্তের মত কীসের দাগ লেগে আছে।

এ ছাড়া কামরার মধ্যে একটা বাক্সে কিছু গাঁজা পাওয়া গেল। দুটো মদের বোতল,—একটা খালি। ল্যাট্রিন অনুসন্ধান করে একটা

লাল হাতলওয়ালা ভোজালী বার করা হল। তার হাতলে আঙুলের ছাপ।

কামরাটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া গেল না।

মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হল।

গোয়েন্দা বিভাগের লোক জন ছদ্মবেশে খবর সংগ্রহের কাজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অন্-দি-স্পট্-এন্কোয়ারী শেষ করে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ফিরে গেলেন। ভারতের প্রত্যেকটি বড বড় শহরে ছবি পাঠিয়ে পুলিশী তদন্তের জন্যে অনুরোধ জানালেন তিনি।

দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার দেওয়া হল।

এদিকে ফটোগ্রাফার ছবি নিলেন। ফিঙ্গার-প্রিন্ট্ এক্সপার্ট আঙুলের ছাপ তুললেন। পুলিশ অফিসার যাবতীয় এক্সিবিট পাঠালেন ফরেন্সিক লেবরেটারীতে। তদন্ত শুরু হল।

কে এই আততায়ী? নিহত ব্যক্তির নাম তো বি. কে. সাউ— কোথায় থাকেন তিনি? কে এই মেয়েটি—যার ফটোগ্রাফ যত্ন করে রাখা ছিল খামের মধ্যে? সঙ্গে গাঁজার মতো নিষিদ্ধ মালেরই বা হদিশ মিলল কেন? তবে কি এরা স্মাগ্লার? মনে মনে নানা প্রশ্ন তুলে সেই হাতিমার্কা খাতাটা খুলে পুরু লেন্সের তলায় মেলে ধরলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ।

খাতাটায় সংসার খরচের সাধারণ হিসেব লেখা। আরো জানা গেল, কোন এক রামনাথ টি স্টল থেকে খাতাটার মালিক

পাঁচশ টাকা ধার করেছে। অপর পাতায় এক কোণে মাত্র তিনটি জেলার নাম এলোমেলো ভাবে লেখা—মুঙ্গের, বাঁকুড়া, রাঁচী। খাতাটার অন্য কোথাও আর কোন জায়গার নাম লেখা নেই।

পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একটা পাতায় এসে বিশেষজ্ঞ চমকে গেলেন। অনেকগুলো ইংরিজি কবিতা লেখা। সবক'টাই প্রেম নিবেদনের কবিতা। মাধবী নামে একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।

নিবিষ্ট মনে পাতার পর পাতা ওলটাতে থাকেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। শেষ কয়েকটা পাতা থেকে আরো জানা গেল যে, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে একটা চামড়ার বড় ব্যাগ, একটা সোনার ঘড়ি ও বিশ হাজার টাকা ছিল।

পুলিশের সাক্ষ্য লিস্টে সেগুলোর কিন্তু উল্লেখ নেই। তাহলে কি আততায়ী সেই জিনিষগুলো হত্যার পর নিয়ে গেছে? না—সেগুলো নেবার জন্যেই হত্যা—?

মহিলা ঘটিত ব্যাপার কি না এত প্রথম দিকে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। সখের বশে আপন খেয়াল খুশিতে অনেকেই প্রেমের কবিতা লেখে।

দেখা যাচ্ছে মৃত বি কে. সাউ সৌখিন মানুষ। অন্ততঃ হাতের লেখা তাই বলে। মধ্যবয়সী। ধনী তো বটেই।

কিন্তু আশ্চর্য! এত দিন হয়ে গেল তবু কোন আত্মীয় স্বজনের খোঁজ পাওয়া গেল না কেন? কেউ টেলিফোনে বা পত্রযোগেও কোন খবর নিল না।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ একটু অবাক হলেন। উপস্থিত ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আচ্ছা ইন্সপেক্টার, নিহত ভদ্রলোকের নাম হয়তো বি.কে. সাউ নয়! উনি হয়তো অন্য কারো টিকিটে ট্রাভেল্ করছিলেন। তাই

আত্মীয় স্বজন ছবি দেখেও মাথা ঘামাচ্ছে না। আর, এক চেহারার কত লোক তো দেখা যায়। তাও হতে পারে।

ইন্সপেক্টার মৃদু হেসে বললেন,

—তা কি করে হবে স্যার? ইনি তো ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট-হোল্ডার। তা ছাড়া খাতাটার মলাটেও তো ঐ একই নাম। আর মনে হয় ওটা ভিক্‌টিমেরই খাতা। খুনের কেস বলে হয়ত কেউ সাহস করছে না।

বিশেষজ্ঞ শান্ত স্বরে বললেন,

—তবুও—। সাম্‌থিং স্ট্রেঞ্জ—মিস্টিরিয়াস্!

দুপুরে ইন্সপেক্টার থানায় ফিরে এলেন।

এসে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর একটা কার্ড দেখে খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন।

কার্ডটি এক ভদ্রমহিলার—। অপরিচিতা। নাম—মালিনী আগরওয়াল। বিশেষ প্রয়োজনে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চান।

অফিসার বেল টিপলেন। একজন কনষ্টেব্‌ল্ সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। অফিসার বললেন,

—বাইরে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন ডাকো।

আবার সেলাম ঠুকে কনষ্টেব্‌ল্ চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঢুকলেন মালিনী আগরওয়াল। অভিজাত ঘরের সুশ্রী, সুবেশা মহিলা। মধ্যবয়সি।

অফিসার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মালিনী আগরওয়ালের মুখের দিকে। চঞ্চল চোখ দুটোতে ভয়ার্ত দৃষ্টি। বিষণ্ণ মুখে ম্লান হাসি।

—বসুন—।

শান্ত স্বরে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন অফিসার মালিনীকে।

ইতস্তত করে মালিনী আগরওয়াল বসলেন। তারপর মাথা নীচু

করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। বোধহয় কোন দ্বিধা, সংকোচ হচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে কান্নাভেজা স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা,

—আমার নাম মালিনী আগরওয়াল। আমি—।

কথাটা শেষ না করেই একটা ছবি ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

একি! এ ছবি তো পুলিশ অফিসারের চেনা।

তবে কি ইনি নিহত ব্যক্তির কোন আত্মীয়া? আর ভদ্রমহিলা কথা বলতে গিয়ে কাঁদছেনই বা কেন? কী রকম আত্মীয়?—কেন? না—অন্য কিছু।

মালিনীর চোখ দুটো জলে ভরে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন,

—আমার স্বামী টু-ডাউনে আসছিলেন। হঠাৎ—

এবার দারুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মালিনী আগরওয়াল।

পুলিশ অফিসার হাত বাড়িয়ে ফটোটা তুলে নিলেন।

ভালভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে ভ্রূদুটো তার কুঁচকে গেল ছবির তলায় নাম সই করা রয়েছে।

কিন্তু সে নাম—বি. কে সাউ নয়, রণদেব আগরওয়াল।

ত হলে কি বি. কে. সাউ আর রণদেব আগরওয়াল একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন নাম! না কি একই রকম দেখতে দুজন মানুষ? পুলিশ অফিসার গম্ভীর স্বরে বললেন,

—আপনার স্বামীর নাম—?

—রণদেব আগরওয়াল।

—যিনি নিহত হয়েছেন তার নাম তো বি. কে. সাউ।

—মনে হচ্ছে ঐ নামের টিকিটেই উনি ট্র্যাভেল্ করছিলেন।

—এ কথা আপনি জানতেন?

—না। খবরের কাগজ পড়ে বুঝেছি। ইনিই আমার স্বামী। কপালে কাটা চিহ্ন রয়েছে। হঠাৎ—।

কথা অসমাপ্ত রেখেই ডান হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরলেন তিনি। চোখের জল মুছলেন মিসেস্ আগরওয়াল নিঃশব্দে।

অফিসার লক্ষ্য করে সান্ত্বনার ছলে বললেন,

—মিসেস্ আগরওয়াল, একটু শান্ত হোন। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। ভেবে উত্তর দেবেন। তাহলেই এ মামলার কিনারা হবে।—

অফিসারের দিকে নির্বাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুললেন মালিনী—কেমন যেন অসহায়।

—আপনার স্বামীর এই ছদ্মনামে ট্রেন জার্নি করাটা কি সত্যিই আন-ইনটেনসানাল, না কোন উদ্দেশ্য ছিল? এটা জানেন তো অন্যের টিকিটে রেল ভ্রমণ করা বেআইনী—? তাহলে রণদেববাবু এটা কেন করলেন?

—জানি না। ব্যবসার জন্যে প্রায়ই নানা দেশে যেতে হয়। হয়তো ঠিক সময়ে সীট বুক্ না করার দরুণ অন্য একজন বন্ধুর টিকিটেই তাঁকে যেতে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোক হয়ত 'স্যাক্রিফাইস্' করেছেন। অবশ্য এটা আমার নেহাৎই অনুমান। ঠিক বলতে পারব না।

—ও—। রণদেববাবু কি প্রায়ই বাইরে যেতেন? কলকাতার বাইরে?

—হ্যাঁ। ব্যবসার জন্যে বিলেত বা আমেরিকাতেও যেতে হত তাঁকে। আমায় কিন্তু সব কথা জানাতেন না—আমি জানতেও চাইতুম না।

—শেষ বার উনি কোথায় গিয়েছিলেন, আপনি জানেন?

—না। ব্যবসার কথাবার্তা উনি সব সময়েই গোপন রাখতেন।

—তাহলে আপনাকেও বলতেন না—?

মালিনী আগরওয়ালের মুখটা লাল হয়ে গেল। কিন্তু সে কি লজ্জা, না অন্য কিছু? ম্লান হেসে বললেন,

—বললুম তো,— আমি জানতে চাইতুম না, অফিসার। ও সব আমি বুঝি না।

এবার পুলিশ অফিসার মিসেস্ আগরওয়ালের চোখে চোখ রেখে বললেন,

—মিসেস্ আগরওয়াল, আপনার স্বামীর কোন শত্রু ছিল কি?

—জানি না।

এবার মিসেস্ আগরওয়ালের উত্তর অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত।

পুলিশ অফিসারের চোয়ালটা সামান্য শক্ত হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

—সন্দেহ করার মত কাউকেও মনে করতে পারছেন? ভেবে বলুন।

—আমার স্বামী বড় ভাল লোক ছিলেন। ওঁর শত্রু ছিল এ কথা ভাবা যায় না।

অফিসার বুঝলেন মালিনী আগরওয়াল কোন কথাই ভাঙতে চাইছেন না। তাই আর সময় নষ্ট না করে বললেন,

—ফটোটা রেখে যান। আমরা ইন্‌ভেস্টিগেশন্ করছি। পরে জানাব।

অগত্যা মিসেস্ আগরওয়াল উঠে পড়লেন গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পুলিশ অফিসার টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগলেন। তারপর রিসিভার রেখে বললেন,

—মিসেস্ আগরওয়াল, কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের জানাবেন। আপনার স্টেট্‌মেন্ট্ আরও লাগবে। পরে খবর দেব। নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে মিসেস্ আগরওয়াল বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় আচমকা প্রশ্ন করলেন অফিসার,

—আচ্ছা মিসেস্ আগরওয়াল, শেষ বার যখন আপনার স্বামী

বাইরে যান তাঁর সঙ্গে বাড়ির কোন লোক ছিল কি? মানে— এই ধরুন, চাকর বা এ্যাটেন্‌ডেণ্ট কেউ? ভেবে বলুন।

—হ্যাঁ ছিল। আমাদের খুব পুরোনো চাকর ভগবত মিশ্র। সে খুব বিশ্বাসী।

মিসেস্ আগরওয়াল সসঙ্কোচে কথাগুলো বলে অফিসারের দিকে চেয়ে রইলেন।

—এখন কোথায় সে?

— জানি না। সে ও আর বাড়ি ফেরেনি। হয়ত সে-ও খুন হয়েছে অফিসার।

—মিশ্র ফেরেনি! তার দেশের বাড়ি কোথায় জানেন? এখানে এই সহরে কি তার কোন আস্তানা আছে?

খানিক ভেবেও মিসেস্ আগরওয়াল কি যেন চিন্তা করলেন. ইতস্তত করে বললেন,

—আছে। এখানে ভবানীপুরে মাঝে মাঝে যেত।

—ও— ভগবতের ছবি আছে? আই মীন— ফটো। পুরোনো লোক। গ্রুপ ফটো ফ্যামিলি ফটো থাকতে পারে

—হাঁ। থাকতে পারে, অফিসার—। খুঁজে দেখব বাড়ীতে। মনে হচ্ছে আছে। আমরা একবার কাশ্মীর গিয়েছিলুম। ভগবতও সঙ্গে ছিল। সেখানে তোলা গ্রুপ ফটোতে ভগবত ছিল।

—বেশ, থাকলে পাঠাবেন। ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

কথাটা শুনেই একবার চমকে উঠে যেন সামলে নিলেন, তারপর হাত তুলে নমস্কার করে জড়িত পদক্ষেপে মালিনী আগরওয়াল বেরিয়ে গেলেন।

শান্ত গলায় পুলিশ অফিসার ডাকলেন—

—হেমন্ত—হেমন্ত—

পাশের ঘর থেকে একজন দ্রুত পদে ছুটে এল। সবে বেরিয়ে যাওয়া মিসেস্ আগরওয়ালকে দেখিয়ে অফিসার বললেন,

—ফলো হার—কুইক্, রাস্তায় ওঁকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা তাও দেখ।

মালিনী আগরওয়ালের কালো গাড়ি থানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। পেছনের সীটে বসে ভয়ার্ত চোখে মালিনী আগরওয়াল এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। চকিত ভয়ার্ত হরিণীর দৃষ্টি।

রাস্তায় অজস্র মানুষের ভিড় - অগণিত গাড়ি।

ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে পেছনে, পাশে, সামনে দেখার অনেক চেষ্টা করলেও ছোট্ট জীপটা তাঁর নজরের মধ্যেই এল না।

কারণ জীপটা অনেক পেছনে। চালকের হাতে শক্তিশালী ছোট্ট দূরবীণ। পথচারীর কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে কৌশলে সেটা চোখের সামনে মাঝে মাঝে ধরছিল হেমন্ত সরকার—পুলিশের ধুরন্ধর গোয়েন্দা।

পরের দিন সকালে পুলিশের লোক সাধারণ পোষাকে মিসেস্ আগরওয়ালের কাছ থেকে ভগবত মিশ্রের ফটো নিয়ে এল। গ্রুপ ফটো। রণদেব ও মিসেস্ আগরওয়াল, আরো অনেকেই রয়েছেন—পেছনে দাঁড়িয়ে ভগবত মিশ্র। ফটোর তলায় সকলের নামও লেখা রয়েছে।

ফটোতে দেখা যায় ভগবত বয়সে প্রৌঢ়। কিন্তু স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ চেহারা। চোখ দুটোতে ধারালো দৃষ্টি। মুখের ভাবভঙ্গিতে বেশ চতুর বলেই মনে হয়।

অফিসার ডাকলেন,

—সন্তোষ—।

একজন এসে বলল,

—বলুন—স্যার।

—ফটোটা রেখে দে—পেছনের ঐ লোকটাকে খুঁজে বের করবি। বড়বাজারে কোথায় তার আস্তানা আছে—. এখুনি বেরিয়ে পড়।

—ঠিক আছে স্যার—

সন্তোষ বেরিয়ে গেল কাজ সারতে।

কর্ৎিকর্মা লোক সন্তোষ। তৃতীয় দিনে বড়বাজারের একটা গলি থেকে ধরল সে ভগবতকে। জীপে তুলে সোজা নিয়ে এল থানায়।

দু-চারটে কড়া ধমকে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ভগবত। বয়সে প্রৌঢ় হইলেও জোয়ান, কর্মঠ। গোঁফ দাড়ি কামানো।

– হুজুর এর বেশী আর কিছু জানি না। বিশ্বাস করুন।

—স্টেশনে বাবুর কাছে এলে না কেন? লাশটা দেখেছিলে?

—হ্যাঁ হুজুর। অনেক লোকের ভিড়ে আমিও দেখেছি। আমার তিন ক্লাশ টিকিট ছিল। বাবুর এক ক্লাশ। সেই রক্তমাখা শরীর দেখে ভয় হল হুজুর। আমি ঘর পালালাম।

—কোথায় যাচ্ছিলেন, তোমার বাবু?

—বোধ হয় মুঙ্গের হুজুর। মাঝপথে বিলকুল খুন হয়ে গেলেন। তাজ্জব কী বাত। মাইজীকে কি খবর দেব, তাই ভেবেই ভয় পেলাম হুজুর। শেষে পালালাম। পুলিস ঘর তল্লাসী করে আমায় আজ পাকড়াল হুজুর। আমিও এই চাইছিলাম। বহুৎ আচ্ছা হল হুজুর।

—কেন? তোমাকেই তো খুনী বলে ধরা হবে? তুমিই বাবুর কামরায় রাত্রে ঢুকে খুন করে দু'হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছিলে।

ভগবত মাথা নীচু করে চোখ বুজিয়ে বসে রইল।

ইন্সপেক্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভগবতের আচরণ লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন।

ভগবত এক সময় চাপা গলায় বলল,

—ঐ দু'হাজার টাকা কি হবে হুজুর? বাবুর-কাছে আমার বকশিস মিলতো বহুৎ। যে হাঁস সোনার ডিম দেয় তাকে কেউ মারে হুজুর? মেরেছে দুশমন। আমায় ছেড়ে দেন হুজুর।

এদিকে রাঁচি, মুঙ্গের, বাঁকুড়ায় ছদ্মবেশী গোয়েন্দার কর্মকলাপ সমানে চলেছে। লক্ষ্য—রামনাথ টি ষ্টল।

মুঙ্গেরের জনবিরল গলি। পর পর দুটো চায়ের দোকান। কিন্তু নাম ভিন্ন ভিন্ন। তবুও গোয়েন্দার কান সজাগ হল। চোখ দুটো একটু বেশী তীক্ষ্ণ।

—চা বহুৎ আচ্ছা—। আউর এক কাপ ভাই সাহাব।

দোকানদার বিগলিত। গরম গরম চা পরিবেশিত হল।

— খাবার চাই—? বহুৎ বড়িয়া খানা আছে।

- খাবার? যা হোক দিন না।

সত্যিই ভালো খাবার দিল দোকানদার। বলে চলল,

— রামনাথ হোটেলের নাম বহুত—। আচ্ছা চা, বহুৎ আচ্ছা খানা।

—এই দোকানের নাম বুঝি রামনাথ হোটেল—?

ভেতর ভেতর খুসি হয় গোয়েন্দা।

—না-না, এটা তো টি-ষ্টল বাবুসাব। হোটেল ও রাস্তায়। যাবেন না কি? বহুৎ বড়া হোটেল—। রেসিডেন্‌সিয়াল।

কেমন যেন রহস্যভরা হাসি।

—রুপেয়া ছাড়লে সব মিলবে। খানা আউর পিনা।

—আউর কুছ পেলে মন্দ হত না। আর একটা জায়গাও চাই রাত্তিরের মতন।

দোকানদার চোখ টিপে হেসে বলল,

—একটু দাঁড়ান। এই শালা হরিয়া, বাবুসাবকো হোটেল পর লে যানা। দশটা টাকা দিন বাবু।

দশ টাকার একটা নোট বের করে দোকানদারের হাতে দিয়ে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা হোটেলে এল।

সামনের দিকটা বাগানওয়ালা বাড়ি। পেছনে হোটেল। নাচ-গানের ব্যবস্থা।

হরিয়ার তদ্বিরে কয়েকজনের আপত্তি সত্ত্বেও আগন্তুকের রাত্রিটা থাকার জন্যে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

নগদ মূল্য একশটি টাকা লেগে গেল। তবুও ক্লান্ত একজন বাঙালীকে ওরা দয়া দেখাতে ত্রুটি করেনি। ভালো খাওয়াই দিয়েছে। মদ দিয়েছে, আর দিয়েছে একজন সুশ্রী মহিলা। ওটাই রীতি হোটেলের। একশ' টাকা খদ্দেরের আলাদা ব্যবস্থা।

কিন্তু হোটেলের সবাই দেখল খদ্দেরটি এতই মদ খেল যে সারা রাতের মতো বেহুঁস হল। কিন্তু গোয়েন্দা সজাগ। ওটাই লোককে সে বিশ্বাস করাতে চায়। দু'চারটে কথা যা কানে এল সেটাই তদন্তের পক্ষে মূল্যবান।

ঘরের ভেতর খাটের পাশে কারা যেন কথা কইছে।

—এ ব্যাটা, সি. আই. ডি. মনে হচ্ছে। খতম করে দে।

একজন বলল।

—নেহি—। দারু পিয়ে বেহুঁস—। ছোড় দে না—। স্পাই নেহি।

—তু থাম্ মাধবী। বিশ্বাস করিস্‌নি অত। আগে যাচাই করেনি।

তারপর কী বিরাট নিস্তব্ধতা ঘর জুড়ে।

ভেতর ভেতর শিউরে উঠল গোয়েন্দা। ভয়ে নয়—আনন্দে।

ঝানু গোয়েন্দা বুঝে ফেলেছে মাধবী নামের একজন হত্যার পক্ষপাতী নয়।

—শুন্ দেভ্‌লাল, যো আদমি সি. আই. ডি. ইয়ে হোটেলমে উয়ো কভি বেহুঁস নেহি হোগা। সম্‌ঝা না বুঢ়বক। এ বিলকুল মাতোয়ালা আদমী। চল্, ঘর ছোড়্।

আবার গোরস্থানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।

কিন্তু ঘরের আলো নিভে গেল। বেহুঁশ ভাবে পড়ে থাকা আগন্তুকের পকেট হাতড়ে কে যেন কি দেখল। —হয়ত টাকা বা হয়তো গুপ্ত পিস্তল।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মাধবী,

—রুপেয়া মাত্ লেগা বেয়াকুফ জংলী। বেইমান। ম্যয় চোর নেহি—নাচনেওয়ালী। চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পরে গোয়েন্দা সেই অন্ধকারের মধ্যেই সারবস্তুর সন্ধানে ফিরতে লাগল। অত্যন্ত সাবধানে, সতর্কভাবে—ধরা পড়লেই মৃত্যু।

মাঝ রাতে পাশের ঘরে ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তায় উঠে দাঁড়াল সে। স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে।

পাতলা কাঠের একটা মাত্র পার্টিশান। কান পেতে উদগ্রীব হয়ে রইল গোয়েন্দা। মেয়েলী গলা।

—রণদেব আয়া তো নেহি। কেয়া হুয়া—?

—ক্যা মালুম।

—পাশের বাবু বেহুঁশ না বদমাশ?

তারপর ফিস্‌ফিস্ বেশ কিছুক্ষণ চলল।

ভালো ভাবে কান পেতেও আর কিছুই শোনা গেল না। শুধু একটা চাপা আর্তনাদ। দরজা খোলার শব্দ।

ছুটে এসে শুয়ে পড়ল গোয়েন্দা।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল মাধবী। গোয়েন্দা জেগে ওঠার ভাণ করল। সহাস্যে এগিয়ে এসে খাটের ওপর বসল মাধবী।

চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল

—তবিয়ত আচ্ছা তো, বাবু? এত্‌না দারু মাত্ পিনা—। এ্যায়সা মর্ যায়েগা একদম। তাজা জওয়ান!

আনমনা ভাবে চুপ করে রইল গোয়েন্দা।

মাধবী মুখ টিপে হাসল বলল

—এ রাস্তা ঠিক নেহি—বহুৎ ঝামেলা। সাদী করে সংসার করুন।

—জানি। তবুও ভাল লাগে। মদ আর তোমরা আছ—এই তো ভাল।

—নেহি। দুশমনকী জায়গা—আমি চলে যাবো—পালাব।

—সত্যি? যাবে আমার সঙ্গে কলকাতায়?

মাধবী অতি সুশ্রী যুবতী। দেহলতায় যে কোন পুরুষের মোহ লাগবে। খদ্দেরের মনোরঞ্জন করাই তার কাজ! সে নাচনেওয়ালী।

নানা উপায়ে খদ্দেরদের কাছ থেকে পয়সা বের করে নেয় সে। বলল,

—মরদের সঙ্গে চলে যেতে ভাল লাগে।

গোয়েন্দা লক্ষ্য করল মাধবীর কোমরে লুকোনো একটা ছোট্ট ছোরা।

—কোমরে ছোরা রাখ কেন—? খদ্দেরকে খুন কর না কি?

হাসল গোয়েন্দা।

মাধবীও সহজ সরল ভাবে হাসল। তারপর চোখ কুঁচকে বলল,

—ও কাম নেহি করেগা। ও দুশমনকা কাম হ্যায়।

—তুমি দুশমন নও? তাহলে এ হোটেলে আছ কেন? এটা তো ভাল জায়গা নয়।

—কোথায় যাব? কোথাও জায়গা নেই। এই জায়গামে জরুর মরনে হোগা। এরা ছাড়বে না। যারা আমায় নিয়ে যেতে চায় তারা মরে। তুমিও মরবে। কলকাতার এক বাবু আমায় নিয়ে পালাবে বলেছিল তাই ছুরি মেরে তাকে মেরে দিয়েছে। টমাস্ সিল্‌ভা—সে ও মরেছে। ওরা মারবেই—কৈ ছোড়েগা নেহি। বেইমান—। দুশমন—। মহাদেব ভি মরেছে। বহুত ভাল লোক ছিল—মহাদেব বর্মন। মরে গেল।

—কে? কে মেরেছে? বল, বল, নাম বল—।

বিপুল উত্তেজনা নিয়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিল গোয়েন্দা মাধবীকে।

—নাম বল, কে খুনী?

আচমকা এ প্রশ্নে চমকে উঠল মাধবী। তার এ ধরনের বেফাঁস কথাতে যে কী ভীষণ মারাত্মক ফল হতে পারে তা স্মরণ করে বুঝি বা শিউরে উঠল ও। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চাপা স্বরে বলে গেল,

—এখানে থেকো না বাবু। চলে যাও। পিছনে একটা দরজা আছে। পালাও।

—তুমি যাবে না?

গোয়েন্দা হাত চেপে ধরল মাধবীর।

—ধরা পড়লে এরা মেরে ফেলবে। ছুরি মেরে খতম করে ফেলবে।

—না। সে শক্তি তোমাদের কারো নেই। এখুনি, এই রাত্রে—এস।

মাধবীকে একরকম জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল গোয়েন্দা চুপি চুপি বাইরে।

আগেই থেকেই ব্যবস্থামত তুজন ছদ্মবেশী পুলিশ জীপ নিয়ে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল রাতের গাঢ় অন্ধকারে।

মাধবীকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে পুলিশ জীপ উল্কার বেগে ছুটল কলকাতা অভিমুখে। ঘন্টায় ষাট মাইল তার গতি। থরথর করে কাঁপতে লাগল লোহার হুড্টা।

গাড়ির ভেতর ভয়ে চোখ বুজল মাধবী।

যদি ধরা পড়ে—রক্ষে নেই। এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কিন্তু প্রত্যেক বারেই ধরা পড়েছে। আর পুরুষরা মরেছে একটার পর একটা।

শোভাবাজার চিৎপুর এলাকায় আগরওয়ালের বাড়ির ভেতরটা কেমন যেন ভয়াবহ, এখানে ওখানে এলোমেলো কত ছোট ছোট ঘর।

রাস্তার দিকের ঘরে থাকেন মিসেস্ আগরওয়াল।

মুঙ্গের থেকে আসছেন শুনে ভদ্রলোক ওরফে ছদ্মবেশী পুলিশ ইন্সপেক্টারকে ভেতরে এনে বসাল মিসেস্ আগরওয়ালের ঝি।

ইন্সপেক্টার জানেন, যে পর্যন্ত তিনি ফিরে না যান সে পর্যন্ত সেকেণ্ড অফিসার মিসেস্ আগরওয়ালকে থানাতেই কৌশলে আটকে রাখবেন। তাই ঝি-কে জানতে না দিয়ে বাড়িটা এখনই সার্চ করতে চান তিনি। বেলা দশটার সময় বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে

হঠাৎ মিসেস্ আগরওয়ালকে টেলিফোনে থানায় ডেকেছেন অফিসার।

মিসেস্ আগরওয়াল কোনদিনই দুপুরে বাড়ি থাকেন না। কোথায় যান কেউ জানে না।

মুঙ্গের থেকে কেউ এলে তিনি বেশী আপ্যায়ন করে থাকেন। প্রায়ই লোক আসে ওখান থেকে। বড় বড় প্যাকেট নিয়ে যায় তারা।

ঝি বলল,

—বড় বড় নস্যির প্যাকেট। বড়বাজারে বাবুর মশলার দোকান আছে। খুব বড় নাম-করা দোকান।

—তাই নাকি ? তোমার বাবু খুব বেড়ান, না ? রেলগাড়ি চড়ে। তোমাকেও তো নিয়ে যান, তাই না ?

– হ্যাঁ—।

ফোক্‌লা দাঁতে ঝি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ঘরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরে সাজানো জিনিসগুলো দেখতে লাগলেন। নানা আকারের বিচিত্র পাখি, কোনটা রূপোর তৈরি, কোনটা প্লাষ্টিকের।

একটা পাখি আকারে খুবই বড়। একটু নাড়াচাড়া করতেই হঠাৎ পাখিটার পেটের কাছটা খুলে গেল।

বিস্মিত ইন্সপেক্টার ভেতরে হাত গলিয়ে দিলেন। একটা ব্যাগ,মনে হল চামড়ার। মাঝারী সাইজের 'কিট্' ব্যাগ। কিন্তু এর মধ্যে কেন ?

ঝি-কে এক গ্লাস জল আনতে বলে ব্যাগটা ত্বরিৎ গতিতে বের করে আনলেন অফিসার। চমকে উঠলেন।

কালো চামড়ার খুব দামি ব্যাগ—গায়ে হালকা লাল দাগ। এ দাগ তো রক্তের।

অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টার সন্দেহ করলেন, এইটা কি সেই চামড়ার ব্যাগ যেটা রণদেব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ? যেটা কামরার মধ্যে পাওয়া যায়নি ?

কিন্তু এটা এ বাড়িতে এল কি করে। তাহলে কি মিসেস্ আগরওয়াল খুনের সঙ্গে জড়িত? তাহলে মুঙ্গেরের হোটেলের সঙ্গে মালিনী আগরওয়ালের যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ

চিন্তিত মনে ব্যাগটা নিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ে বসলেন ইন্সপেক্টার।

ফরেন্সিক লেবরেটারীতে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে—রক্ত আছে কি না। তারপর এই বাড়িটা ঘিরে সার্চ করার কথাও চিন্তা করলেন তিনি। এর জন্যে আইনসঙ্গত ভাবেই যা করার করতে হবে।

রাস্তায় সাধারণ পোশাকে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা আগের মতোই বহাল রইল।

ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করলেন একজন চানাচুরওয়ালা একটা বড় ঝুড়ি সাজিয়ে নিয়ে চিৎকার করে করে চানাচুর বিক্রি করছে। তার পাশেই একজন লোক পথচারীদের সস্তায় ফটো তুলে দিচ্ছে।

তিনটে লম্বা সরু সরু লোহার ডাণ্ডার ওপর একটা ক্যামেরা বসিয়ে কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে ফটো তুলে দিচ্ছে। এ ছাড়া তার কাঁধে আরও দুটো ক্যামেরা ঝোলানো।

শুধু পথচারীদের ডেকে ডেকে অল্প পয়সা নিয়ে ছবি তোলা ছাড়াও তার কাজ আগরওয়ালের বাড়ির মধ্যে যদি কেউ ঢোকে কৌশলে তারও ফটো নেওয়া।

তাই ফটো উঠল জগদীশ কাপুরের।

তার ফটো দেখা মাত্রই মাধবী চমকে উঠল।

তারপর রাগে ফেটে পড়ে বলল,

—দুশমন শয়তান। আমার জীবন নষ্ট করেছে।

তারপর জানাল, নিজের পুরো নামটা সে আজও জানে না। সে শুনেছে পাঁচ বছর বয়সের সময় তাকে চুরি করে মুঙ্গেরে নিয়ে যায় এই জগদীশ কাপুর।

মাধবী জগদীশের পরিচয় দেয়। বলে,

—মাঝে মাঝে জগদীশ মুঙ্গেরে যায়। গোল্ড স্মাগলার। সোনার ঘড়ি, পেন ইত্যাদির চোরাই কারবারও করে।

এ ছাড়া মুঙ্গের, বাঁকুড়া, রাঁচিতে যে হোটেল আছে সেখানে মেয়ে নিয়ে যায় জগদীশ। এদের দল ভারতের বাইরেও রয়েছে। সাপ্লায়ার— যে কোন ভাবে চালান দেওয়াই এদের কাজ।

কেউ বাধা দিলে এরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করে দেয়। এদের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তলও থাকে।

—রণদেব সাগরওয়ালাকে চেনো? কোথায় সে? তাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবী শান্ত স্বরে বলল,

—চিনি বাবুসাব, লেকিন রণদেবকো মার্ডার কিয়া হোগা। এ লোক খুন করেছে।

—কেন?

হঠাৎ লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে গেল মাধবীর।

মাথা নীচু করে বসে রইল, তারপর কোমরের ভেতর থেকে একখানা চিঠি বের করল।

রণদেবের লেখা চিঠি মাধবীর কাছে। তাতে বিয়ের প্রস্তাব করেছে রণদেব।

মাধবীকে নিয়ে সে গোপনে পালাবে হোটেলের নরক থেকে— কলকাতায়।

মাসখানেক আগে শেষ সেবার হোটেলে ছিল রণদেব, সেবার সকলের চোখ এড়িয়ে একসময় চিঠিটা হাতে গুঁজে দিয়েছিল তার।

—কিন্তু রণদেব আর ফিরতে পারেনি মুঙ্গেরের হোটেলে। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই খুন হয়ে গেল সে। আরো তিনজন ভি খুন হল।

—কিন্তু খুনের পর খুন করছে কে? কাকে সন্দেহ হয় তোমার?

—এরা সবাই খুন করতে জানে বাবুসাব। সবাই ছুরি চালাতে শিখেছে। কথায় কথায় ছুরি চালায়। এদের দয়া মায়া কিছু নেই। শয়তান।

—হোটেল কে চালায়? কার হুকুমে দল চলে?

—ঠিক জানি না। তবে জগদীশবাবু সর্দার নয়। লম্বা কালো রোগা একজন লোক হোটেলে এলে জগদীশবাবু সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মাঝে মাঝে রণদেবও থাকত। কী সব কথাবার্তা চলত অনেক রাত অবধি। সবাই কালো মানুষটাকে বলত—বড় ভাই।

মালিনী আগরওয়াল হঠাৎ কেঁদে উঠলেন।

ইন্সপেক্টার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন,

—রণদেববাবু গাঁজার চোরাই কারবার করতেন, হি ওয়াজ এ স্মাগলার।—আপনি জানেন?

—না—।

ক্লান্তস্বরে কান্নাভেজা কাঁপা কাঁপা গলা মিসেসের।

—হ্যাঁ জানতেন। আপনি গোপন করছেন। সত্যি কথা বলুন।

—জানি না।

মাথা নীচু করে সামলাতে লাগলেন মালিনী দেবী।

— জগদীশ কাপুরকে চেনেন? এখানে সে কেন আসে?

এক পলক বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগলে মানুষ যেমন আঁতকে শিউরে ওঠে তেমনিভাবে আঁতকে উঠলেন মিসেস্ আগরওয়াল।

—চেনেন কি না বলুন। মুখ তুলুন মিসেস্ আগরওয়াল। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।

ইন্সপেক্টারের ইস্পাত-সুদৃঢ় কণ্ঠস্বরে মালিনী দেবী মুখ তুললেন। বললেন,

—চিনি। আমার স্বামীর ব্যবসার পার্টনার।

—স্মাগ্লার পার্টির লোক বলুন। তা শেষ কবে এখানে এ বাড়িতে এসেছিলেন মিষ্টার কাপুর? কেন এসেছিলেন? খবর দিতে, যে মাধবী নাচনেওয়ালী পালিয়ে পুলিশের অ্যাপ্রুভার হয়েছে—তাই না? বলুন।—মিসেস্ আগরওয়াল, সময় আমার অল্প। যদি জবাব না দেন তো আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব। জবাব চাই—হ্যাঁ, কি না।

—হ্যাঁ।—

—বড়ে ভাই কোথায় থাকে? মুঙ্গের, রাঁচি, না—বাকুড়া?

—জানি না। তাঁকে আমি চিনি না অফিসার। বিশ্বাস করুন আমি তাকে দেখিনি কোন দিন। তবে নাম শুনেছি।

—বড়ে ভাই খুন করেছে আপনার স্বামীকে। ছুরি মেরে মেরে তার দেহটা ছিঁড়ে ফেলেছে। গলায় ছুরি বসিয়েছে।

মিসেস্ আগরওয়াল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। সারা শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ল ঝড়ের ধাক্কায় শুকনো পাতার মতো। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকলেন,

—মিষ্টার আগরওয়াল ব্যবসায়ের প্রথম দিকে সৎ বলে ব্যবসায়ী মহলে বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তখনও জগদীশ কাপুর দুষ্টগ্রহের মতো আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাননি। চোরা-পথে টাকার সর্বনাশা লোভ দেখালেন জগদীশবাবু। ধীরে ধীরে সেই জালে জড়িয়ে পড়ল মিষ্টার আগরওয়াল। একদিন

ব্যবসায়ী মহলে সবাই জানল রণদেব আগরওয়াল স্মাগ্‌লার। অসৎ ব্যবসায়ী। যখন আমি জানলুম তখন বিষাক্ত বীজ আমার সংসারে ঢুকে গেছে। রণদেব যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে, অফিসার।

কান্না চাপা গলা বিকৃত হয়ে গেল আরো। মালিনী আগরওয়াল তাঁর দুঃখময় জীবনের কথা বলতে থাকলেন।

—রণদেব কেমন যেন বদলে গেল। সংসারে মন নেই। শুধু টাকা, টাকা আর টাকা। তাও ব্যবসা করে নয়, অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে সে। একটা খুনের সঙ্গেও রণদেব জড়িয়ে গেল। তার পর তার জীবনে এল মাধবী নাচনেওয়ালী। চোখের সামনে সর্বনাশা রূপ আর উন্মত্ত যৌবনের ডালি তুলে ধরল সে। রণদেব যেন পাগল হয়ে গেল। সে তাকে—

মালিনী আগরওয়াল থামলেন। বুঝি লজ্জায় তাঁর কথা আটকে গেল।

ইন্সপেক্টার শান্ত স্বরে বললেন,

—রণদেববাবু মাধবীকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু সেটা কেন জানেন?

চোখদুটো জলে ভরে গিয়েছিল। আলতো হাতে মুছে নিয়ে মালিনী আগরওয়াল বললেন,

—বাঁচবার জন্যে। গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচার আর কোন রাস্তা ছিল না, তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে, অফিসার।

—না। বাঁচাবার জন্যে নয়। একটা অসহায় মেয়েকে খুনীদের কবল থেকে বাঁচাতে মিষ্টার আগরওয়াল– থাক্ সে কথা। আসল কথা বলুন। জগদীশ কাপুর কি খুনী? চুপ করে থাকবেন না, বলুন। কে আপনার স্বামীকে খুন করেছে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিসেস্ আগরওয়ালের কাছ থেকে সঠিক পাওয়া গেল না। তিনি শুধু এটুকু জানতেন যে, জগদীশ কাপুর রণদেবকে নিজের হাতে খুন করেনি। অতটা বেইমান সে নয়।

তাহলে কে সেই খুনী?

চিন্তামগ্নভাবে মিসেসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন অফিসার।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ রণদেবের জামা, প্যান্ট ও অন্যান্য জিনিসের রক্ত পরীক্ষা করে 'গ্রূপ' নির্ধারণ করলেন। চামড়ার ব্যাগটাতে দুই গ্রুপের রক্ত পাওয়া গেল। অর্থাৎ খুনীর রক্তও ব্যাগে লেগেছে। তাহলে খুনী নিজেও আহত হয়েছিল।

আরো আশ্চর্য, পোস্ট মর্টেমে রণদেবের পেটে ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ হত্যার আগে রণদেবকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত জগদীশ বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে তার দোকান সার্চ করে কয়েক তাড়া জাল নোট, দুশো বাক্স গাঁজা-আফিং এবং কয়েকটা সোনার বড় বড় তাল ভেতরের ছোট্ট ঘর থেকে টেনে বের করলেন ইন্সপেক্টর

কিন্তু রণদেবকে খুন করার কোন সাক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না। নোংরা জিনিষের মধ্যে একটা চিঠি—দলা-পাকানো অবস্থায় একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে মিলল।

ইন্সপেক্টর সযত্নে সেটা সংগ্রহ করলেন। কি ভাষায় লেখা বোঝা গেল না।

ফরেন্সিক লেবরেটারীতে হয়তো সেটার মর্ম উদ্ধার করা যেতে পারে।······

গুরুমুখী ভাষায় লেখা চিঠি। নাম সই করেছে—বড়ে ভাই। চিঠিতে অনেক কথাই সংকেতে লেখা।

'র-আ' নামে কোন একজন লোককে বিদ্যুৎলতা নামে একটি মেয়ে খুন করবে, তারই ইংগিত দেওয়া আছে চিঠিতে। তারিখটা খুবই পরিচিত মনে হল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের।

রণদেববাবু ঐ দিনই ট্রেনে নিহত হন। একথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে সংকেতে লেখা অক্ষর দুটো পরিষ্কার হয়ে গেল।

'র-আ' অর্থাৎ পুরো নাম রণদেব আগরওয়াল। তাহলে এ হত্যা সুপরিকল্পিত। কে এই চিঠির লেখক? লেখাটা কাঁচা কাঁচা। কোন মেয়ের লেখা বলে মতামত জানালেন হস্তলিপি বিশারদ।

কে এই বিদ্যুৎলতা? সে কি মুঙ্গের হোটেলের কোন নাচনেওয়ালী?

অফিসার ট্রাঙ্ক কল করে মুঙ্গের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলছেন……।

মাধবীর অন্তর্ধানে চামেলীই হোটেলের খদ্দেরদের দেখাশুনো করে। ঘুরে ঘুরে খাওয়াদাওয়া দেখে, তাদের আপ্যায়ন করে।

খুশি হয়ে লোকে তাকে দু'চার টাকা ইনাম দিয়ে থাকে। বেশী রাত করে খদ্দের এলে তাকে মদ দেওয়া হয়।

মদের ঝোঁকে একশ টাকার নোট দিয়ে দিলে তো কথাই নেই। পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ভেতর টপ্ করে ফেলে দেয় চামেলী।

যাতে কেউ দেখতে না পায়।

মাঝে মাঝে পুলিশ দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হোটেলে! কিন্তু চামেলি নিষিদ্ধ জিনিষ চোখের আড়াল করে মুহূর্তের মধ্যে।

মোটা টাকার খদ্দেরকে হাতছাড়া না করে গুপ্তপথে মাটির নীচে নিয়ে যায়।

এর পর জ্ঞানহীন অবস্থায় পরের দিন সেই লোকটাকে কোন পার্কে না হয় হাসপাতালে পাওয়া যায়। অবশ্য যদি নেহাৎই আয়ুব জোর থাকে। তা নাহলে সাধারণত সে জ্ঞান আর ফেরে না।

এটাই এ হোটেলের রীতি।

গুপ্তঘরে শুধু যে গাঁজা স্মাগ্‌লিং হয় তাই নয়, জাল নোট ছাপারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এ ছাড়া আছে মেয়েদেব ধবে এনে তাদেব পাকাপাকি বসবাসেব ব্যবস্থা কবে দিয়ে বেআইনী পতিতালয় চালানো।

কিন্তু চামেলীব চোখকে ফাঁকি দিয়ে মদের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মেশাতে অসুবিধে হয়নি গোয়েন্দা বিভাগের ঝানু অফিসার মিস্টার মল্লিকের।

যথাসময়ে পুলিশ 'রেড' হওয়া থেকে আরম্ভ করে গুপ্ত ঘরে যাওয়া ও চামেলার সঙ্গে রাত্রিবাসের প্রস্তাব দেওয়াব মধ্যে কোন চাতুরী ধরার মতো ক্ষমতা হোটেল কর্তৃপক্ষেব ছিল না।

তাই চালে ভুল করল চামেলী।

মদের ঝোঁকে সে মাধবী, জগদীশ কাপুর ও বড়ে ভাইয়ের অনেক গল্প করল। কথায় কথায় গুপ্তঘর কোথায়, কি আছে সেখানে সবই বলে ফেলল।

আরো জানাল, মাধবী জগদীশ কাপুরের জারজ কন্যা। আর জাল নোট যা তৈরি হয় মাধবী জগদীশ কাপুরের কলকাতার হোটেলে পৌঁছে দেয়।

না বোঝার নিখুঁত ভাণ করে প্রত্যেকটি কথাই তীক্ষ্ণ সজাগ কানে শুনতে লাগলেন গোয়েন্দা।

তারপর অত্যন্ত হালকাভাবে জিজ্ঞেস করে বসলেন,—বড়ে ভাই কে চামেলী?

প্রথমে চমকাল, তারপর কোন সন্দেহের কারণ নেই ভেবে নিয়ে হাসল চামেলী। স্বাভাবিক নয়, মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাসি।

ব্লাউজের মধ্যে তখন তার কর্‌করে দু'খানা একশ টাকার নোট।

কেউ এত দেয়নি কোনদিন। তাই এমনিতেই মনটা সদয় ছিল। তার ওপর বিলিতি মদের নেশা।

বলল,

— কৈ নেহি। বিল্‌কুল্‌ ঝুটা। পুলিশকো বুদ্ধু বানানেকে লিয়ে—

পকেট থেকে গুরুমুখী ভাষার চিঠিটা কৌশলে চামেলীর মাথার বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা। তারপর এক সময় অপ্রকৃতিস্থ চামেলীর হাত লেগে বেরিয়ে এল চিঠিটা।

অবাক হ'য়ে চিঠিটা খুলে চেয়ে রইল চামেলী। হঠাৎ বলল,

—এ তো মাধবীর লেখা চিঠি! এখানে কি করে এল?

থর থর করে গলার স্বরটা কেঁপে গেল তার।

গোয়েন্দার স্থির দৃষ্টি চামেলীর মুখে চোখে। চামেলীর শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তার ওপর ঘুমের ওষুধের প্রভাব সুরু হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান হারালো চামেলী।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরোলেন গোয়েন্দা। চিঠিটা গোপন পকেটে রেখেছিলেন : খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

সামনে আর একটি মেয়ে।

এ কি!

রণদেব আগরওয়ালের হোল্ডলের মধ্যে যে ফটোটা পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারা অবিকল এক।

থমকে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটিও। চেয়েছিল একদৃষ্টে। চোখে তার বিরাট সন্দেহ। ডান হাতটায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

—বাথরুমে যাব।

হঠাৎ গোয়েন্দা বলে বসলেন। যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাইলেন।

এবার হাসল মেয়েটি।

তারপর আঙুল তুলে দূরে একটা ঘর দেখিয়ে ভেতরে চলে গেল। গুপ্ত পথে গোয়েন্দাও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

পরের দিন ভোর বেলাতেই বিরাট পুলিশ বাহিনী হোটেল ঘেরাও করল।

গুলি বিনিময় হল পুরোদস্তুর। শেষ পর্যন্ত সকলকেই গ্রেপ্তার করা হল।

ঘুমন্ত চামেলীকে সশস্ত্র পাহারায় রেখে স্থানীয় পুলিশ অফিসার পনেরটি মেয়ে ও সাতাশ জন দুর্বৃত্তকে থানায় এনে লোহার গারদে ঢোকালেন।

এদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ।

নোট জাল করা, বেআইনী গাঁজার চোরাকারবার করা। গোপনে নানা প্রদেশের মেয়ে অপহরণ করে অসৎ কাজে লাগিয়ে দেওয়া, এর ওপর আছে রণদেব আগরওয়ালের হত্যা।

আগেই বলেছি, ফরেন্সিক রিপোর্টে চামড়ার ব্যাগের রক্তের দুটো আলাদা গ্রুপ পাওয়া যায়—একটি রণদেবের রক্তের গ্রুপ, কিন্তু আর একটি ?

আরো একটি মিলল বিদ্যুৎলতার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে। কিন্তু তবুও আশ্চর্য, বিদ্যুৎলতা খুন করেনি রণদেবকে।

সে রাত্রের সব ঘটনাটা বিদ্যুৎলতা আদালতে বলল।

আদালতে সেই গুরুমুখী ভাষার চিঠিটা দেখে চমকে উঠল মাধবী।

তারই হাতের লেখার সঙ্গে এই লেখাটার অবিকল মিল আছে। কারণ রণদেবকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল মাধবীর নিজের।

রণদেব মাধবীকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। ততদিনে মাধবীর মোহ কেটেছে ? তাই সে চাইল বিদ্যুৎলতাকে। মাধবীকে সে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। রণদেবের আচরণে

মাধবী রেগে গিয়ে প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করে। রণদেব বিদ্যুৎলতাকে নিয়ে কলকাতা পালাবে জেনে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে মাধবী।

এদিন প্রথম শ্রেণীর কামরায় বি. কে. সাউ ছাড়াও আর যে দুজন মহিলার নামে টিকিট কাটা হয়েছিল তাদের নাম আলাদা হলেও ওরাই ছিল মাধবী আর বিদ্যুৎলতা।

মাধবী বিদ্যুৎলতাকে সহজভাবেই বলেছিল, কলকাতায় জগদীশ কাপুরের কাছে যাচ্ছে।

মাঝরাতে একসময় ঘুমন্ত রণদেবের মদের বোতলে কি যেন চট করে মিশিয়ে দিল মাধবী।

অভ্যাসমত রণদেব মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মদ খাবে সেটা তার অজানা ছিল না।

রণদেব মদ খেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সামান্য জ্ঞান হারাতেই মাধবী কোমরের ভোজালী খুলে রণদেবের গলায় বসিয়ে দেয়।

রণদেবের মৃত্যুযন্ত্রণার চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় বিদ্যুৎলতার। ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বাধা দেয় রণদেব। টলতে টলতে সে ধরে ফেলে বিদ্যুৎলতাকে।

আবার ভোজালীটা চালায় মাধবী। এবার রণদেবের গায়ে না লেগে বিদ্যুৎলতার ডান হাতে আমূল বিঁধে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞানের মতো হয়ে যায় সে। এর পর মাধবী পাগলের মত রণদেবের দেহে এলোমেলো ভোজালী চালাতে থাকে।

মাধবী শুধু বলছিল,

—বেইমান্ কুত্তার বাচ্চা।

রণদেব মারা গেল।

শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তার ওপর ভোজালীর উপর্যুপরি আঘাত।

পরের স্টেশনেই নামবে ওরা। সঙ্গে রণদেবের চামড়ার ব্যাগটা নিল। মাধবীর সোনার ঘড়ি ও বিশ হাজার টাকা ওর মধ্যে ছিল।

গাড়ির গতি হঠাৎ কমে গেল। প্রায় স্টেশনে থামে থামে। উত্তেজনার বশে মাধবী কোন কিছু চিন্তা না করেই ভোজালীটা লাট্রিনের মধ্যে ফেলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল।

বিদ্যুৎলতাকে সে এক হাতে চেপে রেখেছিল। এই পর্যন্ত বলে বিদ্যুৎলতা থামল। ডান হাতটা তার তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

বিদ্যুৎলতার সাক্ষ্য আদালতে প্রাধান্য পেয়েছিল। ফিঙ্গার প্রিন্ট্ পরীক্ষাতে ভোজালীর উপর আঙুলের যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা বিদ্যুৎলতার নয়—মাধবীর।

বিদ্যুৎলতা আরো জানাল যে সে একান্ত নিরুপায় হয়েই মাধবীকে ছাড়তে পারেনি। কারণ কলকাতার সে কিছুই চেনে না। তাই খুনের ঘটনা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মাধবীর সঙ্গে কলকাতায় আসে জগদীশ কাপুরের বাড়ি।

সেদিন রাত্রে জগদীশ কাপুরের ক্ষুধার শিকার হতে হয়েছিল তাকে।

মাধবী এইভাবে তার ওপরেও প্রতিশোধ নিয়েছিল। মাধবী খুনী।

সত্যিই রণদেব আগরওয়ালাকে খুন করেছে মাধবী।

বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হল।

আদালত বিদ্যুৎলতাকে ছাড়া আরও পনেরোটি মেয়েকে রেস্কিউ হোমে রাখার নির্দেশ দিলেন।

জগদীশ কাপুর এতদিন শুধু যে গোপনে বেআইনী চোরাই মাল সাপ্লাই করছিল তাই নয়, মিসেস্ আগরওয়ালকেও ব্ল্যাক্মেল করছিল। শেষদিকে বিবাহ করতে বাধ্য করেছিল। মিসেস্ আগরওয়াল থানায় গিয়েছিলেন সে কথা জগদীশ জানত না।

জগদীশ কাপুরই এই পাপ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ও মুঙ্গেরের

হোটেলের মালিক। ভারতব্যাপী তার এক বিরাট স্মাগ্‌লিং র‍্যাকেট্‌
—একটি মস্ত বড় দল।

আদালত জগদীশ কাপুর সমেত আরো বাহান্ন জন ক্রিমিন্যালের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করলেন মিসেস্ আগরওয়ালের নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন আদালত।

ভগবতকে বেকসুর ছেড়ে দেওয়া হল। সত্যিই বেচারা ভয়েই পালিয়েছিল।

লোহার পোলটা পার হয়ে এসেই পুলিশ জীপ আর্তনাদ করে থমকে দাঁড়াল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে স্থির দৃষ্টিতে নীচের দিকে চেয়ে রইলেন পুলিশ অফিসার—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা কম্বল জড়ানো বস্তু পোলের নীচে পড়ে আছে।

কয়েকটা কুকুর বস্তুটার আশপাশে ঘুরছে।

শহর থেকে আঠারো মাইল ভেতরে একটি বিরাট জঙ্গল। কুখ্যাত স্থান····



দুটো একটা মৃতদেহ প্রত্যেক দিনই জঙ্গলের মধ্যে পড়বেই। পুলিশের সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের হাতে নাতে ধরা প্রায় অসম্ভব।

পোলের পাশের জমি ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। পুলিশ অফিসার জীপ থেকে নেমে অত্যন্ত সাবধানে এবড়ো খেবড়ো পথ বেয়ে নীচে এলেন। সঙ্গে তিনজন কনস্টেবল্। একজন কনস্টেবল্ কম্বলটা খুলে দিল।

পুলিশ অফিসার যা ভেবেছেন তাই।

একটি মানুষের মৃতদেহ। পুরুষ। জোয়ান বয়স। মাথায় চাপ চাপ রক্ত। এ ছাড়া তলপেটে অজস্র রক্তপাতের চিহ্ন রয়েছে।

তাহলে আততায়ী লোকটিকে কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে খুন করেছে।

ধীরে ধীরে তলপেটের কাপড়টা সরিয়ে দিলেন অফিসার। বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন।

কী নৃশংস হত্যা!

আততায়ী তলপেট থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্যে একটা খবরের কাগজের পাতার খানিকটা ছিঁড়ে ক্ষতস্থানের মুখে চেপে ধরেছিল। রক্তের সঙ্গে লেগে কাগজটা ক্ষতস্থানেই আটকে রয়েছে।

সারা শরীরটা থেকে একটা পচা গন্ধ বেরুচ্ছিল। মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে। তারপর কম্বল, মাটির রক্ত, খবরের কাগজটা এক্জিবিট করে আলাদা আলাদা প্যাকেটে মুড়ে নিয়ে যেতে হবে ফরেন্সিক লেবরেটারীতে।

একজন কনস্টেবলকে ওখানে রেখে অফিসার সোজা চলে এলেন মাইল দুয়েক দূরে একটি ছোট্ট গ্রামে। নাম ইন্দারিয়া।

সেখান থেকে একখানা গরুর গাড়ি জোগাড় করে অফিসার ঘটনাস্থলে নিয়ে এলেন।

গাড়িটা বাঁশের তৈরি। খড়, ইট ও চূণ বালি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বয়ে বয়ে বেড়ায়। গাড়ির মালিক মুসলমান। রোগাটে চেহারা, অত্যন্ত গরীব। কেমন যেন ভয় ভয় ভাব।

তার ওপর য়্যুনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে। গাড়োয়ান যন্ত্রের মতো কাজ করল। নীচে নেমে কন্‌স্টেবল্‌দের মৃতদেহটা তুলে আনতে সাহায্য করল।

নিজেই দড়ি বের করে বাঁধল, যাতে অসমতল জায়গায় মৃতদেহটা গড়িয়ে মাটিতে না পড়ে যায়।

সব কাজ মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

অফিসার এর মধ্যেই এক সময় গাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়েছেন। বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও বালি, কোথাও বা চুণ সুরকি লেগে রয়েছে।

হঠাৎ এক জায়গায় নজর পড়তেই অফিসার থমকে দাঁড়ালেন।

এক টুকরো কালো মোটা চুলের মতো কি যেন লেগে রয়েছে। আরো এক জায়গায় কোণের দিকে খানিকটা গাঢ় কালচে রঙের মতো বেশ শক্ত জিনিস।

কি এটা!

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার জিনিসটা চেনেন না তা নয়। ভাবতে চেষ্টা করলেন তিনি, কেমন করে ও জিনিসটা এই গরুর গাড়িতে লেগে থাকতে পারে? তাহলে কি—?

সদর হাসপাতালের পাশেই মর্গ। মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেমের জন্যে ওখানে রেখে অফিসার গরুর গাড়িটা সোজা থানায় নিয়ে এলেন। গাড়ির মালিক হতভম্ব হয়ে অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অফিসার বললেন, - মিয়াঁ, তোমার গাড়ি ধুয়ে দিতে হবে তো, তাই রাখলুম। মড়া তুলে নিয়ে এসেছ, ভালো করে ওষুধ দিয়ে ধুতে হবে। তোমার আরো গাড়ি তো আছে।

মিয়াঁ বিগলিত হয়ে বলল,

—হুজুর মা বাপ—।

গলাটা তার কেঁপে উঠল। ভয়ে না আনন্দে ঠিক বোঝা গেল না।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,

[redacted] তুমি ছাড়া আর কে কে এই গাড়ি চালায় বল তো?

[redacted]লায়।

[redacted]ই বেয়াড়া। খাটতেই চায় না

—কেন ?

অফিসার শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার ওপর দিয়েই চালাচ্ছে। জোয়ান মদ্দ, লজ্জা নেই।

—আর কে আছে তোমার সংসারে ?

—বউটা মরে গেছে। এক বুড়ো ফুফা আছে হুজুর, ফুফা মানে আপনারা যাকে বলেন—

অফিসার বললেন,

—আমরা যাকে বলি পিসেমশাই, তাই তো ? তা সে কি কাজ করে না ? তার কত বয়স মিয়াঁ ?

—তা বয়েস হয়েছে, মাঝে মাঝে গাড়ি চালায়। তবে কম।

—কত বয়েস—?

—আইজ্ঞে চার কুড়ি তো হবেই। লোক ভালো হুজুর। মাটির মানুষ।

—তাই না কি ? যাব একদিন, আলাপ করে আসব।

অফিসারের পায়ের ধুলো নিয়ে মিয়াঁ চলে গেল।

মিয়াঁ বেরিয়ে যেতেই টেলিফোন তুলে পুলিশ হেড্‌ কোয়ার্টার্সে ঘটনাটা জানালেন তিনি, আর ঐ সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার পাঠাতে অনুরোধ করলেন।

মৃতদেহের ছবি নিতে হবে। দেওয়ালে দেওয়ালে, গাছের ডালে, হাটে বাজারে, রেল স্টেশনে সর্বত্রই সে ছবি টাঙাতে হবে।......

সরকারী ফটোগ্রাফার কাজ সেরে চলে গেলেন তখন দুপুর দুটো হবে।

অফিসার অন্যমনস্কভাবে থানার ডাইরীর পাতা ওলটাতে লাগলেন।

কেউ কি কিছু হারানোর সম্বন্ধে ডাইরী করে গেছে ? মনে তো পড়ে না। তাহলে এই মৃত লোকটির কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই ?

হয়ত এ গ্রামের লোক নয়—দূর কোন গ্রাম থেকে মেরে এনে মৃতদেহটা পোলের তলায় ফেলে গেছে।

লোকটা গুণ্ডাদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা তাই বা কে জানে? হয়ত চোরাই মাল ভাগাভাগি করতে গিয়েই মারা পড়েছে। খাতার শেষ কটা পাতায় ধীরে ধীরে চোখ বোলাতে লাগলেন অফিসার।

সবাই মারামারি করে জখম হয়েছে। নিতাই মল্লিক, হারাণ মণ্ডল, শশধর পাইন। সকলকেই চেনেন অফিসার।

গ্রামের মানুষ তদন্ত করেও এসেছেন যথাসময়ে। সাধারণ ঘটনা।

এই তো নিত্যকালী হাজরা। স্বামী সুজন হাজরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বৌ নিত্যকালী নাকি চোর। ঘরের জিনিষ চুরি করে বিক্রি করে দেয়। আবার লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাইদের দিয়ে দেয়। গরীব তারা।

মনে মনে হাসলেন অফিসার। এ কেসটার মীমাংসা করতে গিয়ে কত মজার ঘটনাই না ঘটেছিল। এক সময় রাগের মাথায় সুজন হাজরা নিত্যকালীর হাত ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে এনে অফিসারের সামনে দাঁড় করাল। নিত্যকালীর বয়স অল্প। লজ্জায় মাথার ঘোমটা বেশ খানিকটা টেনে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

সুজন হাজরা বলল,

—হুজুরকে বল্।—বল্ না। আমি তোকে বাড়ি থেকে বার করেছি? আমি বলে গিয়ে তোকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, পাছে কেউ নজর দেয়···আর আমি ঘরের বৌকে বের করে দিয়েছি? পাড়ার লোক থানায় খবর দিয়েছে। যত্ত সব হারামজাদার দল—।

সুজন হাজরা প্রৌঢ়। একটু উত্তেজিত হলেই হাঁফাতে থাকে।

নিত্যকালীর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল—

—হ্যাঁ বার করে দাওনি তুমি? বললে না, যা নেত্য বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা—। এখন উল্টো কথা বলছ?

অফিসার জানেন, নিত্যকালী সুজন হাজরার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী।

হঠাৎ সুজন হাজরা রাগে ফেটে পড়ল। অফিসারের সামনে হাত দুটো জোড় করে বলল,

—হুজুর—বুঝেছি। আর বলতে হবে না। তিন কুড়ি বয়েস হল আমার—ক্ষেতের চাষ করি বলে কি বুদ্ধি নেই নাকি? বুঝেছি সব।

—কি বুঝেছ সুজন?

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার।

—ঐ নেত্য—ওর এখন আর এই বুড়োকে পছন্দ হচ্ছে না—। বেশ, যা চলে যা—ঝামেলা বাড়াসনে—।

—কিন্তু খাবে কোথায় বল—বিয়ে করা বৌ তোমার। চারিদিকে যা বদলোকের আড্ডা—ঘরের বার হলে রক্ষে আছে?

সুজন হাজরা চোখদুটো লাল করে বলল,

—আপনি নিয়ে যান—চোর বদমাস তো আপনার ধারে ঘেঁসবে না—আপনি রাখুনগে—এখানে এ সব ঝামেলা ভাল লাগে না। নেত্য যা—হুজুরের কাছেই যা—।

অফিসার এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। মাথামোটা সুজন হাজরার কথাগুলো উপভোগ করছেন তিনি। এবার গলার স্বর খাটো করে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন,

—বেশ তো তাই হবে কিছু দিন এখন তোমার ঘরেই থাক। পরে একদিন দেখা যাবে কেমন?—আর যেন বৌ টার ওপর অত্যাচার করো না, বুঝলে? অত্যাচার করলে হাজতে পুরে রাখব। কোন গোলমাল যেন না শুনি।

অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে সুজন হাজরা বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল।

ডাইরীর পাতাটা ওলটালেন অফিসার। এক জায়গায় এসে চমকে উঠলেন। পীরগাঁ থেকে কে যেন এসে ডাইরী করে গেছে এক সপ্তাহ হল। মানুষ নিখোঁজ। তদন্তে যাওয়া হয়নি এখনও।

তবে কি····

মিনিট পনেরোর মধ্যে প্রস্তুত হলেন অফিসার।

দু-জন কন্সটেব্‌ল্‌ নিয়ে গাড়ি চলল পীর গাঁ।···

পুলিশ দেখে বাড়ির মালিক ভয়ে জড়সড় হয়ে বেরিয়ে এল। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,

—সাধন সামন্ত কার নাম?

—আজ্ঞে—আমার—। আসুন, ভেতরে বসুন।

অফিসার ভেতরের ঘরে এসে বসলেন। তারপর শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন,

—ডাইরী করেছিলেন থানায়—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—। না করে উপায় ছিল না—আমি বুড়ো মানুষ।

হঠাৎ হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল সাধন।

অফিসার সান্ত্বনার স্বরে বললেন,

—দুঃখ করবেন না—, যা হবার তা হয়েছে, এবার বলুন তো কি কি ঘটনা ঘটেছিল—

—আজ্ঞে—যে দিন ডাইরী করি তার আগের দিন সকাল থেকেই ওকে পাইনি। ভাবলুম মাছ ধরতে গেছে বিহারীগ্রাম। ওখানে বড় ঝিল আছে।

—আপনার কে হয়?

—আজ্ঞে, ছেলে। তারপর শুনুন স্যার। সকাল গেল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল—তবু দেখা নেই। রাত ভিতে সন্দেহ হল, তখন পাড়ার প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলুম— সত্য কোথায়? সবাই বলল, জানি না। বুঝুন মনের অবস্থা, কোথায় গেল, কি হল।

—ছেলের বয়স কত?—

—আজ্ঞে তা বিশ বছর তো হবেই, লম্বা চওড়া চেহারা—মনে হয় পঁচিশ। তারপর শুনুন স্যার। ভাবলুম মাছ ধরতে গিয়ে হয়ত জলে ডুবে গেছে, না হয় কেউ হয়ত—

—তারপর—কখন খবর পেলেন?

—কাল। আমার—।

অফিসার থামিয়ে দিয়ে একটা ফটো বের করে বললেন,

—যাকগে। যা হবার হয়ে গেছে। এই ফটোটা দেখুন তো?

সাধনবাবু ফটোটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বললেন,

—এটা কি স্যার—কার ফটো?

অফিসার বিস্মিত হয়ে বললেন,

—সে কি! আপনি চিনতে পারছেন না—?

—না তো—এঁকে তো চিনি না স্যার। এতো মরে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।

—আপনার ছেলে নয়—? ঠিক দেখে বলছেন তো?

—না—না। আমার ছেলেকে আমি চিনব না? এ কে?

অফিসার ফটোটার দিকে চেয়ে বললেন,

—একেই তো খুন করা হয়েছে।

—খুন! আমার ছেলে তো খুন হয়নি। সে তো তার মামার বাড়িতে গিয়েছে। খবর পেয়েছি স্যার। আমার শালা খবর দিয়ে গেছে। তা ছাড়া তার চেহারা তো অন্য রকম। দেখবেন?

—থাক্। বুঝেছি। চললুম।

অফিসার বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়লেন। সাধনবাবু সলজ্জে বললেন

—মিছিমিছি কষ্ট করে এলেন স্যার।

—না—তাতে কি হয়েছে। এ তো আমাদের ডিউটি। আপনি ছেলের খোঁজ পেয়েছেন তো—বাস্, তাতেই আমি খুসি

ছেলে বাড়ি এলে থানায় খবর দেবেন। ভুলবেন না যেন। নমস্কার।

দিন কয়েক পরে পুলিশ অফিসার গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছেন এমনি সময় একজন মহিলা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

জীপ থেকে নেমে এলেন অফিসার।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মহিলার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

—আমার কাছে এসেছ কি ?

মহিলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অফিসার ভেতরে এলেন। আপিস ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—বল কি চাও ?

এবার মহিলা হঠাৎ অঝোরে কাঁদতে লাগল। অফিসার দেখলেন, মহিলাটি বিবাহিতা। ভাবলেন, হয়তো সংসারে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে। বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। কয়েক মিনিট কেটে গেল। কান্নার শব্দ কমে এল

কিছুক্ষণ পরে মহিলা মুখ তুলে বলল,

—আমার স্বামী তিন দিন বাড়ি আসেনি। পাড়ার সকলে বলছে, সে মরে গেছে…

—কি নাম তোমার স্বামীর ?

মহিলা ইতস্তত করে জড়ানো স্বরে বলল,

—শিবলাল হাজরা।

—কি কাজ করে ? কোথায় ?

—বড় শহরে সরকারী চামড়ার কারখানায় কাজ করে।

—কি করে বুঝলে তোমার স্বামী মারা গেছে?

—সবাই বলছে হাটে বাজারে ছবি টাঙানো হয়েছে। তারা সেই ছবি দেখেছে……।

অফিসার চমকে উঠলেন। শিবলাল হাজরা। এই মহিলার স্বামী।

অফিসার ড্রয়ার থেকে একটি ফটো বের করে বললেন,

—এই ছবি চেনো? হাটে বাজারে এই ছবিই টাঙানো হয়েছে। এই কি তোমার স্বামী?

মহিলা ছবির দিকে চেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

অফিসার ফটোটা পকেটে রাখলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—তোমার স্বামীর হত্যাকারীকে যাতে ধরা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। তুমি বাড়ি যাও। আমি সিপাই সঙ্গে দিচ্ছি।

মহিলাও উঠে দাঁড়াল. তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলল,

—আমি প্রিয়লালবাবুর কাছে গিয়েছিলুম—

—প্রিয়লালবাবু কে?

—আমার স্বামীর আপিসে কাজ করে। ও বলল, আমার স্বামী নাকি তিন দিন আপিসেও যায়নি।

—ঠিক আছে। আমি খোঁজ নেব।

বলে অফিসার একজন কনস্টেবলকে ডাকলেন। বললেন,

—তুমি একে পৌঁছে দাও। একটু দূরে দূরে থাকবে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে এ থানায় এসেছিল।

ওরা চলে যেতে পুলিশ অফিসার জিপ নিয়ে গেলেন। কয়েকটি প্রয়োজনীয় তদন্ত সেরে দুপুরের দিকে হাজির হলেন পাঁচ মাইল দূরে একটি সরকারী আপিসে। পুরো নাম যার, 'গভর্ণমেণ্ট লেদার ট্যানিং-কাম-ট্রেনিং সেণ্টার।'

এখানেই কাজ করত শিবলাল হাজরা।

জিপখানা একধারে রেখে ট্রেনিং সেন্টারের ভেতরে এলেন অফিসার। কিন্তু আশ্চর্য! সব ঘর বন্ধ। বাড়িটাতে কোন লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

বিস্মিত হয়ে দারোয়ানের খোঁজ করলেন অফিসার। তাকেও পাওয়া গেল না। অগত্যা বাইরে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সাইকেলে করে একটি লোক সোজা ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে ঢুকে গেল।

অফিসারও দ্রুত পদে ভেতরে এলেন।

সাইকেল থেকে নেমে লোকটি অফিসারের কাছে এল। অফিসার প্রশ্ন করলেন,

—আজ কি ট্রেনিং সেণ্টার খুলবে না?

লোকটি মাথা নেড়ে বলল,

—না, আজ কাল হু'দিন বন্ধ।

অফিসার ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন,

—একটা জিনিস জানবার ছিল। আচ্ছা, আপনি এখানে কি করেন?

লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল,

—মানে—? আপনি কি চান?

অফিসার সহজ ভাবেই বললেন,

—আপনি কে জানতে পারলে আমার সুবিধে হত। কিছু জানবার ছিল কি না।

পুলিশ অফিসার বুঝলেন যে তাঁর পরণে ইউনিফর্ম নেই বলে লোকটি তাঁর সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করছে। এবার তিনি একটু দৃঢ় স্বরেই বললেন,

—আপনি এখানে কি করেন? আপনার নাম দয়া করে জানাবেন কি? আমি থানা থেকে আসছি।

লোকটি এবার একটু বিচলিত হল। বলল,

—আমি এই ট্রেনিং সেণ্টারের কেয়ার টেকার রঙ্গলাল পরামাণিক। আপনি?

পুলিশ অফিসার লোকটির প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে বললেন,

—শিবলাল হাজরাকে আমার চাই। কোথায় সে? এখানে সে কি কাজ করে বলুন।

—আজ্ঞে শিবলাল এখানকার মেসের ঠাকুর, রান্না করে। আজ চারদিন হল সে আসেনি। শুনছি, কোথায় পালিয়েছে।

—কেন, পালাল কেন?

—কি জানি স্যার, আমার কাছে একশ টাকা ধার করে নিয়ে চলে গেল। বললে বাড়ি যাব।

—কোথায় যাবে?

—কি যেন বলেছিল ঠিক মনে পড়ছে না স্যার। বাড়ি না কোথায় যেন যাবে বলল। তারপর আর আসেনি। মেস বন্ধ। ছেলেরা স্টেশনের হোটেলে খেয়ে আসে।

—আর কিছু শিবলালের সম্বন্ধে জানেন?

—আজ্ঞে না—

—সে কি—শিবলাল খুন হয়েছে জানেন না?

—খুন! শিবলাল খুন হয়েছে!

লোকটিকে হতভম্ব করে দিয়ে অফিসার জিপে এসে চড়লেন!

হাতে সময় অল্প। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট এবং অন্যান্য এক্জিবিট্ প্যাকেট করে কালই পাঠাতে হবে ফরেন্সিক লেবরেটারীতে। তারপর কৌশলে খোঁজ করতে হবে প্রিয়লালের। ঐ সঙ্গে শিবলালের স্ত্রীর বক্তব্যটুকুও শুনতে হবে।

অফিসার গাড়ির স্পীড্ বাড়ালেন।

প্রিয়লাল বসাক।

শিবলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ট্রেনিং সেণ্টারের একজন কেরানী। শিবলাল তার স্ত্রী মহামায়ার অন্যায় আবদার মেটাতে মেটাতে প্রায় পাগলা হয়ে গিয়েছিল। কেবল টাকা আর টাকা। অল্প মাইনের চাকরি শিবলালের অথচ স্ত্রীর চাহিদা ছিল অনেক। এর জন্যে প্রিয়লালকেও টাকা ধার দিতে হত শিবলালকে।

—আর কার কাছে টাকা ধার নিত শিবলাল?

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নে চিন্তা করে বললেন প্রিয়লাল,

—আপিসের কেয়ার টেকার রঙ্গলাল পরামানিকের কাছে।

—রঙ্গলাল লোকটা কেমন মনে হয়, প্রিয়লালবাবু?

— মনে তো হয় ভালই, তবে একটু বদমেজাজী। সুদের হার বড় চড়া।

—রঙ্গলাল থাকে কোথায়? আপিসেই?

—হাঁ, আপিসের পেছনের বাগানে ওর আলাদা কোয়ার্টারস্ আছে। এ ছাড়া এখান থেকে এক মাইল দেড় মাইল দূরে চন্দ্রহাটে ওর নিজের একটা ছোট্ট বাড়ি আছে বলে শুনেছি। চাকরির আগে ওখানেই থাকত। কাল বলছিল, বাড়িটার কিছুটা অংশ ভাড়া দেবে তাই হোয়াইট ওয়াশ করছে। এ ছাড়া শিবলাল আর কার কাছে কি টাকা ধার নিত জানি না। তবে দু-হাজার টাকার মত বাজারে ওর দেনা হয়ে গেছে, স্যার।

—মহামায়া দেবী লেখাপড়া জানেন?

—একেবারে মুখ্যু নন। জানেন কিছু কিছু। তবে ভয়ানক আপ্-টু-ডেট্ মহিলা।

—হুঁ।

চিন্তিত মুখে নমস্কার জানিয়ে অফিসার বেরিয়ে এলেন। ভারী অদ্ভুত লাগল তাঁর। স্ত্রী স্বামীর স্বল্প আয় জেনেও কেন এত খরচা করে? আর কিসেই বা এত টাকা খরচা হয়? মহামায়া কি

ধরণের মেয়ে? তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করার মতো কিছু আছে কি?

এক সপ্তাহ পরে। ফরেন্সিক সায়েন্স লেবরেটারী।

অফিসার ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় এসে হাজির হলেন। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন,

—বসুন, অফিসার—.

—আমি শিবলাল হাজরার কেসটার ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে এসেছি। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল স্যার।

—হ্যাঁ। খবরের কাগজের বাকি অংশটা পেয়েছেন? শিব-লালের ক্ষতস্থানে যে কাগজের ছেঁড়া অংশ পাওয়া গেছে তার বাকি অংশটা চাই। আর প্লেস্ অব মার্ডারটা বের করতে হবে।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন,

—গরুর গাড়িতে পাওয়া মোটা কালো চুলের মতো জিনিষটা হচ্ছে একটা পশম। আর সেটা ঐ এক্জিবিট নাম্বার তিন—কম্বল, তার সঙ্গে মিলে গেছে। অর্থাৎ এক্জিবিট নাম্বার টু—উল, আর এক্জিবিট নাম্বার থ্রি—ব্ল্যাঙ্কেট এর উল এক।

—সেকেণ্ড পয়েন্ট,—ব্লাড ক্লট্ অন্ দি গাড়ি। কাপড়ে রক্তের ড্যালাটা হিউম্যান ব্লাড্ এবং তার গ্রুপ ঐ কম্বলে, কাগজের টুকরোতে এবং ক্ষতস্থানে লেগে থাকা রক্তের গ্রুপের সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল।

—নাউ কাম টু অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে ঐ গরুর গাড়িটা। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে ঐ গাড়িটা শিবলালের

মৃতদেহ বয়ে পোলের তলায় এনেছিল, সুতরাং গাড়ির মালিক নিশ্চয় ব্যাপারটা জানে। তবে সহজে বলবে না। কারণ, সে টাকা নিয়েছে খুনীর কাছ থেকে, আর স্বীকার করলে পুলিশী হাঙ্গামা আছে। তবুও ওটাই আমাদের প্রধান সূত্র।

পুলিশ অফিসার তাঁর তদন্তের সব কিছুই সবিস্তারে বিশেষজ্ঞকে জানালেন। শিবলালের স্ত্রী মহামায়ার ওপর তাঁর সন্দেহের হেতুটুকুও বলতে ভুললেন না।

বিশেষজ্ঞ মৃদু হেসে বললেন,

—ইয়েস্ দেয়ারস্ দি রুট। ওখানেই ফোকাশ করুন। সমস্ত ঘটনার পেছনে একটা মানসিক দুর্বলতা কাজ করছে কিনা দেখতে হবে। যাকে বলা হয়, ফ্রেল্টি।

আলোচনা শেষে অফিসার নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন।

মিয়াঁর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না অফিসার, তাই আবার প্রশ্ন করলেন,

—তোমার ভাই সত্যু রাগারাগি করে কাল চলে গেছে? তোমার এখানে আর থাকে না? তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ, বলছ?

—আইজ্ঞা কর্তা। ওর মতো বোকা মানুষেরে না রাখাই ভাল। বসে বসে আমার ঘাড়ের ওপর গিলবে। দিয়েছি দু-চার থাপ্পড়—

—কিন্তু ওকে যে আমার চাই। মিয়াঁ, তোমার গরুর গাড়িতে চুণ বালি ইঁট ছাড়া মাঝে মাঝে ইয়ে, মানে মরা গরু মোষও নাও তো? বেশী পয়সা পেলে আপত্তি কর না—কেমন?

মিয়াঁর মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আড়ষ্ট গলায় বলল,

—হুজুর পয়সার লোভ আমার নাই, দুটো নুন ভাতে চলে যায়। আমার ভাইটার বড় বড় আশা, টাকার লোভ এত—।

—তাই মাঝে মাঝে চুণ বালির মধ্যে গাঁজার থলি, আফিঙের ঝোলা সবই পাচার করে, তাই না?—

—আইজ্ঞা! চমকে ওঠে মিয়াঁ,—না—না হুজুর।

—বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে দিন দশ আগে একটা মরা মানুষের লাসও গাড়িতে নিয়ে গেছে মিয়াঁ—।

এবার অফিসারের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় কর্কশ শোনালো। মিয়াঁ না বোঝার দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে চেয়ে রইল। মুখ চোখ অত্যধিক লাল হয়ে গেছে, কপালে ঘাম জমেছে।

পুলিশ অফিসার এবার কঠিন হাতে মিয়াঁর কাঁধ দুটো চেপে ধরলেন। বললেন,

—কোন ভয় নাই মিয়াঁ, শুধু বল, কোথা থেকে মরা মানুষ তুলেছিলে, কোথায় ফেলেছ। বললেই ভাল হবে, না বললে ছাড়ব না। তোমার গাড়িতে মানুষের রক্ত পাওয়া গেছে। মানুষ খুন হয়েছে।

মিয়াঁ অকস্মাৎ হাঁউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

কান্নার আওয়াজে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। ক্ষীণ তার দৃষ্টি, তবে স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই, বেঁটে কালো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অফিসারকে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

—কে তুমি, কি চাও বাপ?

মিয়াঁ কান্না থামিয়ে বলল,

—ফুফা, ইনি দারোগাবাবু। আমার গাড়িতে মানুষ খুন করে বয়ে নিয়ে গেছি কি না তাই জানতে চাইছেন। আমি তো কিছুই জানি না। তুমি জানো?

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলল,

—দারোগাবাবু ঠিকই ধরেছেন। মনে হচ্ছে আমাদের গাড়িতে

মরা মানুষের লাশ আমিই নিয়ে গেছি। ফেলেছি ঐ লোহার পোলের তলায়। সত্যি বলব বাপ। জগতে ধর্ম আছে, আল্লা আছে, পরকাল আছে।

অফিসার রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কোথা থেকে নিয়েছিলে মরা মানুষটাকে—মনে আছে?

—এখান থেকে বাপ অনেক দূর, সেও একটা গাঁ।

—কি নাম? মনে করে বল। ভয় নেই কিছু....বল।

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে চোখদুটি ছোট করে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল। তারপর বিড়বিড় করে বকতে লাগল আপন মনে,

—এইতো গেল দশের হাট···বাঁয়ে গেলুম পোণাগাছি ····তারপর মাঝের পট্টি ···বিহারীগ্রাম···তারপর কি যেন নাম ···'লারহাটি·· চাঁদের হাটা ···হ্যাঁ মনে পড়েছে, ঐ চাঁদের হাটা।

—কি বললে, চাঁদের হাট, মানে—চন্দ্রহাট।

হঠাৎ চরম উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইল অফিসারের কণ্ঠস্বর। বললেন,

—কি রকম বাড়ি বল? ছোট্ট বাড়ি?

—হাইজ্জে অত দেখি নাই। দুজন লোক এসে নিয়ে গেল, বলল, ঐটে বইতে হবে, দশ টাকা দেব রাজি হয়ে গেলুম। তখন সূর্যের আলো এই বললেই হয় অন্ধকার। লোক দুটো কম্বল জড়ানো একটা লম্বা জিনিস তুলে দিলে গাড়িতে। অতশত বুঝি নাই বাপ। হায় হায়। ওটা কি মানুষের লাশ না কি? বাতি ছিল নাই ঘরে; অন্ধকারে ঠাউরে দেখলুম বাপ, বাড়িটা ভাঙাচোরা। হাঁ। ছোটই হবে। হায় হায়, আল্লা তুমি এ কি বিপদে আমায় ফেললে—।

চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলেন অফিসার।

সমস্যা সমাধানের পথটা যেন দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ বলল গ্রামের নাম চন্দ্রহাট। সরল সহজ মানুষ এরা, ছল চাতুরীর ধার ধারে না।

সত্যকে এরা শ্রদ্ধা করে, ধর্মকে ভালবাসে—ইহকাল পরকালকে করে ভয়।

আর মহামায়া? মহামায়া ধর্ম মানে না, সত্যকে বিশ্বাস করে না, মানুষের ওপরে তার শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু পরকালকে করে ভয়। তাই পুলিশ অফিসারের কাছে সে অকপটে স্বীকার করল তার পাপের কাহিনী।

সে চাইল শাস্তি, হোক মৃত্যু, তাই সে চায়।

—হ্যাঁ, আমিই শিবলালের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। শিবলাল আসলে আমার স্বামী নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। এলাহাবাদের কর্ণেলগঞ্জে আমার বিয়ে হয়। স্বামী ছিল মাতাল বদচরিত্র। শিবলাল আমার স্বামীর বন্ধু। সেই সুবাদে ও আসা যাওয়া করত। কোন্ এক আপিসে শিবলাল কাজ করত। মাস গেলে টাকা পয়সা ভালই রোজগার করত। আমার স্বামীও চাইত শিবলাল বাড়িতে আসা যাওয়া করুক। আমার আপত্তি করার কিছু ছিল না। সন্ধ্যের পর একদিন মাতাল হয়ে আমার স্বামী ঘরে এল, সঙ্গে শিবলাল।

—জুয়ো খেলে হেরেছে প্রচুর টাকা। তার ওপর মদ খেয়েছে। বেহুশ। শিবলালও মদ খেয়েছিল, তবে অল্প। আমার স্বামীর জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ হ্যারিকেনের আলোটা নিয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে খেলা করতে লাগল শিবলাল। আলো—অন্ধকার। এক সময় সবটাই অন্ধকার হল। আমি চিৎকার করে ওঠার আগেই শিবলাল আমার মুখটা চেপে ধরল। বলল,—তোমার স্বামী জুয়ো খেলে হেরেছে, আমি দেড়শ টাকা জিতেছি। সেটা তোমাকে দিতে এসেছি। বুক

পকেটে টাকাগুলো খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। সত্যি এক গোছা নোট। জুয়োখেলা টাকা—তার গরম অনেক।

—আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে যাচ্ছিল শিবলাল। নিজের নোংরা দেহটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে শিবলালের জামাটা চেপে ধরলুম। চাপা স্বরে বললুম,—টাকা—টাকা দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে স্বামীকে সব বলে দেব—টাকা চাই আমার। ওর কাছ থেকে দেড়শ টাকা ছিনিয়ে নিলুম আমি। এর পর থেকে প্রতি মাসেই টাকা দিত শিবলাল।

অফিসার এক সময় জিজ্ঞেস করলেন,

—তোমার স্বামীর নাম কি?

মহামায়া রহস্যজনক ভাবে ম্লান হেসে বলল,

—কেন? তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন? সে শিবলালকে খুন করেছে?

অফিসার অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, শান্ত স্বরে বললেন,

—অপরাধ না করলে আদালতে শাস্তি হবে না কারো। শিবলালকে একজন না একজন তো কেউ খুন করেছে। কিন্তু কে সে? সেটাই অনুসন্ধান করা আমার কাজ। ফাঁসি কাঠে ঝোলানো আমার কাজ নয়।

এবার মহামায়া সহজ ভাবে বলল,

- আমি খুন করেছি। আমি আদালতে তাই বলে আসব।

—বাজারে এত ধার জেনেও তুমি শিবলালের কাছে টাকা চাইতে কেন? তোমার পাগলামির জন্যেই হয়তো শিবলাল মারা গেল, টাকা শোধ দিতে পারেনি, তাই খুন হল।

—মিথ্যে কথা!

সাপের জিভ দিয়ে যেন বিষাক্ত নীল হিংসার গরল গড়িয়ে পড়ল, —কোন্‌ শয়তান বলেছে? প্রিয়লাল? আমার খরচের জন্যে টাকা সে ধার করত না। ধার করত—শয়তান ঐ লোকটার জন্যেই।

ছোবলের পর যেন নির্জীব হল ভুজঙ্গ। হাঁফাতে লাগল মহামায়া। দম নিল কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাসের ধাক্কায় নাকটা ফুলে উঠল।

অফিসার নিরুত্তর। মহামায়া বাঁকা হাসি হেসে ক্ষীণ স্বরে আবার শুরু করল,

—গোপন চুক্তি হয়েছিল আমার স্বামীর, শিবলালের সঙ্গে। মহামায়াকে নিয়ে শিবলাল থাক। শুধু প্রতি মাসে দুশো করে টাকা দিতে হবে আমার স্বামীকে। আর না দিলে—মরতে হবে।

—তুমি এ কথা কি করে জানলে—?

—পরে শিবলাল আমায় বলেছিল। আরো বলেছিল, তার বাঁচার পথ নেই। তাকে মরতেই হবে। আমার স্বামী একটা নর পশু হয়েছে এ আমিও শুনেছি। সে আমাকেও আর বাঁচতে দেবে না। আমার বাড়ির চারপাশে তাকে একদিন ঘুরতে দেখেছি।

—কিন্তু নাম বলছ না কেন? কে সে—?

হঠাৎ চীৎকার করে হেসে উঠল মহামায়া। বীভৎস সে হাসি। উন্মাদের হাসি।

—বলব, সব বলব। নিজের পাপের কথাটা সেরে নিই, তার পর বলব আমার স্বামীর নাম। এত ব্যস্ত কেন? নাম বললেই তো—

মহামায়ার কথাটা শেষ হল না, বাইরে রাস্তায় হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দ।

অফিসার ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে এলেন। বাইরে পাহারারত কনস্টেব্‌ল্‌কে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি হয়েছে—বোমা ফাটালে কে?

কনস্টেব্‌ল্‌ দূরে একটা সাইকেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,

—ঐ লোকটা বোমা ছুঁড়ে পালাল।

অফিসার কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে ফিরে এলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঘরের মেঝেতে রক্তের ধারার মধ্যে মহামায়া ছটফট্ করছে। বুকের মধ্যে তার বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা।

অফিসার ঝুঁকে পড়ে মহামায়ার মুখের দিকে চাইলেন,—চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল তার। দেহটা নিশ্চল।

অফিসার বুঝতে পারলেন আততায়ী ঘরের পেছনের জানলার বাইরে আত্মগোপন করে ছিল। বোমা ফাটার শব্দে অফিসার রাস্তায় ছুটে যেতেই গরাদবিহীন জানালা টপকে আততায়ী ভেতরে এসে কাজ সেরে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত স্বামীর নাম বলা হল না মহামায়ার। তবুও আন্দাজ করেছেন অফিসার ঠিকই, ধরা তাঁর কষ্ট হবে না। একবার প্রিয়লাল-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার আগে হাসপাতালে খবর পাঠানো দরকার।

মৃতদেহটাও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পরের দিন।

অফিসারের জিপ এসে দাঁড়াল প্রিয়লাল বসাকের বাড়ি। তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

কড়া নাড়তেই একজন গুণ্ডা চেহারার লোক দরজা খুলে দিল। অফিসার গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমার বাবু কোথায়?

—আমার বাবু—? মানে—?

—মানে—প্রিয়লালবাবু—। কোথায়?

—প্রিয়লালবাবু আমার বাবু নয়, আমার কাকা।

—ও—।

বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হলেন অফিসার। বুঝলেন, যাকে তিনি বাড়ির চাকর ভেবেছেন সে আসলে এ বাড়ির মালিক। তাই 'তুমি' বলতে আর সাহস করলেন না। গলার স্বর সামান্য নরম করে বললেন,

—তা আপনার কাকাকে ডাকুন।

অফিসার ভেতরে এসে চেয়ারে বসলেন। ভাইপো বলল,

—কাকা নেই।

—গেছেন কোথায়?

—জানি না। দিন দুয়েক হল ফেরেননি।

—সে কি! প্রিয়লালবাবু নিরুদ্দেশ! কৈ আমি তো জানি না?

—আপনি কে জানতে পারি কি? আমি তো আপনাকে চিনি না। অবশ্য আমি এখানে থাকি না। এইমাত্র এসেছি। কে আপনি?

—আমি এই গ্রামের থানা অফিসার। আপনার নাম?

—রমাকান্ত বসাক। আপনি কি কাকার বন্ধু?

অফিসার স্থির দৃষ্টিতে রমাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—হঠাৎ এখানে কেন এসেছেন রমাকান্তবাবু? মানে, এই গ্রামে?

—কাকা ডেকেছিলেন তাই এসেছিলুম। কাকার খেয়াল তো। চিঠি লিখে ডাকলেন। আমিও চলে এলুম। এসে দেখি নেই। চাকর বলল, কাকা দিন-দুয়েক হল কোথায় যেন গেছেন।

—কি করেন আপনি?

—কলকাতায় ব্যবসা করি। এলুম, কাকার দেখা নেই।

—কোথায় গেছেন জানেন না? সত্যি করে বলুন?

—কি করে জানব বলুন—চিঠি লিখে রেখে তো যাননি। কাউকে বলেও যাননি। কী মুস্কিল বলুন তো?

—হঠাৎ আপনাকে ডাকলেন, আবার হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেন। এদিকে গ্রামে খুনও হল···সবই অদ্ভুত রমাকান্তবাবু।

রমাকান্ত শিউরে উঠে বলল,

—খুন! সে কি—! আপনি কি কাকাকে খুনের জন্যে সন্দেহ করেছেন নাকি? তাহলে আপনি কি সার্চ করতে এসেছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথায় ঢুকছে না।

—কারণ ব্যাপারটা বড়ই ঘোরাল হয়ে গেল যে। অকস্মাৎ আপনার আবির্ভাব····কাকার অন্তর্ধান—মাঝখানে একটা খুন।

রমাকান্ত ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,

—কাকা খুন করেছে? না না···অসম্ভব। কাকা ভীতু মানুষ।

—রমাকান্তবাবু—

অফিসার হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বললেন—

—কাকার লেখা চিঠি কোথায়? এনেছেন সঙ্গে করে—?

—আজ্ঞে না—।

—প্রিয়লালবাবু কোথায় আপনি জানেন, বলুন। সত্যি বলুন।

—জানি না—

—চাকরকে ডাকুন—এখান থেকে চেঁচিয়ে—। ডাকুন—

রমাকান্ত চীৎকার করে ডাকল

—সদা—সদা—সদানন্দ—

কোন সাড়া নেই। অফিসার বললেন,

—চলুন ভেতরে—।

সারা বাড়ি এ ধার ও ধার খুজেও সদানন্দকে পাওয়া গেল না।

এবার রমাকান্ত শুধু যে-বিস্মিত হল তা নয়, ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে শুকনো গলায় বলল,

—এ তো ভারি তাজ্জব মনে হচ্ছে। শেষে কি খুনের দায়ে জেল

নাকি? একি ভূতুড়ে ব্যাপার সব—। আমাকে কি ষড়যন্ত্র করে এখানে আনা হয়েছে নাকি?

অফিসার মৃদু হেসে বললেন,

—বড্ড ভয় পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

—পাবারই তো কথা। আর সে ভয় তো আপনিই দেখাচ্ছেন। কোথায় কে খুন হল আর আপনি সন্দেহ করছেন আমাকে। কাকা কোথায় গেছে আমি কি জানি যে বলব। চাকরটা হয়ত জানত সেও পালিয়েছে। এখন—?

—এখন চুপ করে শুয়ে বসে থাকুন। আপনি যেন আবার টুক্ করে পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাহলেই—সর্বনাশ হবে। এ কথাটা মনে রাখবেন। বাড়িটা পুলিশ নজরে রাখছে, মনে থাকে যেন!

পরের দিন অফিসার লেদার ট্রেনিং সেণ্টারে এসে পৌঁছলেন তখন বেলা বারটা হবে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপনে প্রায় ঘণ্টা-খানেক আলোচনা করে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলেন তিনি।

হঠাৎ অদূরে নজরে পড়ল একটা খাটিয়ার ওপর বসে বসে দুলে দুলে বই পড়ছে রঙ্গলাল পরামানিক। হঠাৎ অফিসারের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই রঙ্গলাল মৃদু হেসে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করতেই হাত নেড়ে বসে থাকার ইঙ্গিত করে অফিসার দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন।

থানায় ফিরে টেলিফোন তুলে নিলেন······।

পুলিশ হেড্ কোয়ার্টার্সে যথারীতি সংবাদ পৌছল। চন্দ্রহাটে একটি বন্ধ বাড়ি সার্চ করার অনুমতি চাইলেন অফিসার, ঐ সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ফরেন্সিক রসায়নবিদ্কেও অন্-দি-স্পট্-এন্-কোয়ারীতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানালেন।

ঝক্ঝকে তক্তকে নতুন রঙ-করা বাড়ি।

তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকলেন পুলিশ অফিসার।

সামনের ঘরটা খালি। ভেতরের ঘরের দেওয়ালে কাঠের তৈরি একটা মস্ত বড় তাক। মালপত্তর রাখা হয়। সেই কাঠের ওপর লাল্চে দাগ।

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ কাঠের অংশটুকু চেঁছে নিয়ে বেন্জিডিন পরীক্ষা করলেন। রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। এ ছাড়া তাকের তিন পাশের দেওয়ালের চূণ চেঁছে নেওয়া হল। তাতেও বেশ রক্ত। ঘরের অন্য কোথাও, অন্য কোন দেওয়ালে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ঘরের এক কোণে বেশ খানিকটা আবর্জনা দেখা গেল, একটা চূণ গোলা জলের বাল্তি, একটা বুরুশ, শিরীষ কাগজ ও এক বাণ্ডিল খবরের কাগজ।

বাণ্ডিলটা তুলে নাড়াচাড়া করতেই একটা ছেঁড়া টুকরো কাগজ মোটা বাণ্ডিলটা থেকে খসে মাটিতে উড়ে পড়ল।

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন,

—হিয়ার ইজ্ দি রিমেনিং পার্ট অব দ্যাট্ পেপার, অফিসার—দি আদার পার্ট ইজ্ উইথ্ আস্।

অফিসার বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন। ফরেন্সিক অভিজ্ঞ সহাস্যে বললেন,

—শিবলালের ক্ষতস্থান যে কাগজের টুকরো দিয়ে ঢাকা ছিল তারই বাকিটা এই এইখানে, ওটা সংগ্রহ করুন। দুটো মিলিয়ে আমরা দেখব। মনে হচ্ছে নিশ্চয় মিলবে।

অফিসার সযত্নে মাটি থেকে কাগজটা তুলে নিলেন।

—রক্তের দাগগুলো নষ্ট করার জন্যেই এই ঘরে নতুন করে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে। খুনী খুব চালাক। কিন্তু আমরা সেই আসল জিনিসটা পেলুম না কেন?

—কোন্‌টা স্যার—?

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ মৃদু হেসে বললেন,

—সেই ছোরাটা কোথায় লুকোনো আছে? শিবলালের মৃতদেহ কিছু সময় ঐ তাকের ওপর রাখা ছিল। কিন্তু খুন করা হয়েছে কোথায়? সেটা দেখা দরকার। চলুন, সেটা অনুসন্ধান করি।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাড়ির পেছনে এলেন। ছাদে ওঠার জন্যে একটা মই লাগানো রয়েছে। কেন? তাহলে ছাদে কেউ উঠেছে বা ওঠে?

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ ছাদে উঠলেন। বড় বড় থান ইঁট এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

পা দিয়ে ইঁটগুলো সরাতে লাগলেন। ছাদের নর্দামার ওপরেই যে বড় ইঁটটা সেটা সরাতে গিয়ে আটকে গেল।

কৌতূহলী হয়ে ফরেন্সিক অভিজ্ঞ ডান হাত দিয়ে থান ইঁটটা সরালেন।

আশ্চর্য, ইঁটটায় একটা কালো সুতো বাঁধা। সুতোটাতে টান দিতেই নর্দমার ভেতর থেকে উঠে এল একটা বড় ছোরার খাপ।

খুলে দেখা গেল—খাপের ভেতর চক্‌চকে একটা ছোরা। পরীক্ষা করে রক্ত পাওয়া গেল।

আগে থেকেই সুব্যবস্থা করা ছিল। তাই বিশেষ চাতুরী খাটিয়েও খুনী গা ঢাকা দিতে পারল না।

খুনের রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক অন্তর্ধানের জন্যে সচেষ্ট হল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবেই ট্রেণ স্টেশন ছাড়তে দেরি করতে লাগল দেখে উৎকণ্ঠিত হল সে।

ঘণ্টা আধেক পরে অফিসারের আবির্ভাবে স্টেশন মাস্টার মশাই বললেন,

—আপনার নির্দেশ পেয়েই ট্রেণটা ষ্টেশনে 'ডিটেন্' করিয়েছি। কি ব্যাপার অফিসার?

—কে—যাবেন কে?

—একজন মহান অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছি। আপনার গাড়িতেই তিনি আছেন, মানে সোজা বাংলায় বলা চলে—পালাচ্ছেন। এই তো, এই কামরাতেই রয়েছেন।

পুলিশ অফিসার কামরার সামনে যেতে ছদ্মবেশী একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ সেলাম দিয়ে সরে দাঁড়াল। অফিসাব কামরার মধ্যে ঢুকে রিভলবার খুলে সামনে ধরে বললেন,

—আসুন রঙ্গলালবাবু—-আমরা প্রস্তুত।

শিবলালের খুনী রঙ্গলাল পরামানিক ধরা পড়ল।

কিন্তু তবুও কাহিনীটা যেন শেষ হয়েও শেষ হল না।

তাই ওদের দুজনের ব্যর্থ জীবনের আরও কিছু কথা বলতে হবে। সম্পূর্ণ করতে হবে ঐ সঙ্গে মহামায়ারও কলংকময় নারী জীবনের বিষণ্ণ অধ্যায়।

কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একদিন শিবলাল মহামায়ার নারীত্ব হরণ করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘোড়ার বাজির খেলায় জিতলেও আসলে জীবন জুয়ার খেলায় শিবলাল কিন্তু সম্পূর্ণ হেরে গেল। মাত্র একদিনের অপরাধের কুৎসিত ঋণটুকু তাকে সারা জীবন ধরে শোধ করতে হল, —এই হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

রঙ্গলাল জানতে পেরেছিল তার স্ত্রী মহামায়া আর সতী নয়। তাই মহামায়ার ওপরে সে অত্যাচার শুরু করল। সে চাইল শিবলাল মহামায়াকে নিয়ে চলে যাক।

একদিন সে কথাটা শিবলালকে খোলাখুলি ভাবেই বলে ফেলল।

হতবাক হয়ে জঘন্য প্রস্তাবটুকু কান পেতে শুনল শিবলাল।

মহামায়ার সারা দেহে কাল কাল চাবুকের দাগ লক্ষ্য করেছে সে, একটা অন্ধ বেদনা সারা বুকটাতে জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তার। এত বড় অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করবে না সে। বাঁচাবে সে অসহায় মহামায়াকে এই শয়তানটার চাবুকের ছোঁয়াচ থেকে।

শিবলাল রাজি হল। কিন্তু মহামায়ার বিনিময়ে রঙ্গলালকে দিতে হবে দুশো করে টাকা,—প্রতি মাসে।

শিবলাল চমকে উঠল। এত টাকা সে পাবে কোথায়?

নিরুপায় হয়ে একদিন শিবলাল মহামায়াকে নিয়ে এলাহাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

কৃতজ্ঞতায় মহামায়া শিবলালকেই মনে মনে স্বামী বলে গ্রহণ করল। তার যৌবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে শিবলালকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরল।

মাস-দুয়েক পরে শিবলাল অনেক চেষ্টায় সরকারী ট্রেনিং সেণ্টারে চাকরী পেল।

কিন্তু বছর না ঘুরতে ঘুরতেই মূর্তিমান মৃত্যু রঙ্গলালের রূপ ধরে ট্রেনিং সেণ্টারে এসে হাজির হল।

বিস্ফারিত চোখে শিবলাল শিউরে উঠল। রঙ্গলালের নিঃশ্বাসে

যেন বিষধর সাপের হিস্‌হিস্‌ শব্দ শুনতে পেল সে। মানস দৃষ্টিতে সে দেখল রঙ্গলালের আটাশটা পা অক্টোপাসের মত কিল্‌বিল্‌ করছে। প্রত্যেক পায়ের ধারাল নখগুলো চক্‌চক্‌ করছে।

রঙ্গলাল চাইল টাকা। আর কিছু নয়। মহামায়ার ওপরে বিন্দুমাত্র মোহ নেই, তার দেহের ওপর কোন লোভ নেই তার। শিবলাল ভোগ করছে করুক।

সে চায় টাকা। তা না হলে সে বাঁচতে দেবে না শিবলালকে।

শিবলাল টাকা জোগাড় করতে লাগল। বুঝল, রঙ্গলাল তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। মহামায়া বাধা দেয়। বলে,

—না—না—টাকা তুমি দিও না। পুলিশে খবর দাও।

পুলিশের নামে ভয় পায় শিবলাল। মুখে কিছু বলে না।

একদিন শিবলাল রঙ্গলালকে টাকা দিতে অসম্মতি জানাল। টাকা সে দেবে না। আর দেবার সামর্থ্য তার নেই। রঙ্গলাল তাকে মুক্তি দিক।

হাসল রঙ্গলাল পরামাণিক। বলল,

—সে কি···? বৌ দিয়েছি—টাকাও নেব না—তাহলে আমার কি থাকল বল? কি নিয়ে বাঁচব শিবলাল? টাকা আমার চাই।

—তুমি এত নিষ্ঠুর রঙ্গলাল? আমার বন্ধু না তুমি?

—হ্যাঁ সেই জন্যেই তো বৌ-কে বিক্রি করে দিলুম তোমার কাছে।

—বিক্রি! কি বলছ তুমি, ভাই?

—ঠিকই বলছি। বিনিময়ের যুগ এটা শিবলাল। সবাই বেচা কেনা করছে সংসারে। যার টাকা আছে সেই কিনছে।

—মহামায়া কিন্তু—

—থাম। রেসের টাকা পকেট ভরে থাকত তোমার কাছে, মহামায়া তার দেহ বিক্রি করেছে, সেই টাকা নিয়েছে সেদিন দু-হাত ভরে। সে বিক্রি করেছে তুমি কিনেছ। তোমার চক্‌চকে টাকার আরশীতে সে নগ্ন দেহটা তুলে ধরেছে, তুমি ভোগ করেছ—।

বিশ্রী কুৎসিত হাসিতে মুখ চোখ ভরিয়ে ফেলেছিল রঙ্গলাল।

শিবলাল বুঝতে পারল রঙ্গলাল তার চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করেছে বটে, তবে সে হয়ে উঠেছে ক্রুর, অর্থ-পিশাচ, হিংস্র। সে বিপুল টাকার মালিক হয়েছে তবুও সে শিবলালকে ছাড়বে না। সে তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চায়। প্রয়োজন হলে সে হত্যা করবে।

শিবলাল যন্ত্রণার বীভৎসতায় কুঁকড়ে গেল। মাসে মাসে কর্‌করে দুশো টাকা গুণে দিতে লাগল।

প্রচণ্ড বাধা দিল মহামায়া। এত বড় অন্যায় সে হতে দেবে না। গরুড়ের প্রতিদিনের আহার্য্য সে মুখের ওপর তুলে দিতে দেবে না শিবলালকে।

প্রকাশ্য হত্যার ভয় দেখাল রঙ্গলাল। টাকা না পেলে সে খুন করবে। জীবন জুয়ার হাটে সে লোকসানে মাল বেচতে বসেনি। সে প্রাপ্যটুকু ছিনিয়ে নেবেই। এই তার প্রতিজ্ঞা।

টাকা দিয়ে সে চাপা দিতে চায় তার অন্তর্দাহ—সব কিছু হারানোর জ্বালা। কিন্তু টাকা সে পেল না।

অগত্যা শিবলাল হাজরা নিহত হল।

সত্যি মিথ্যে জানি না, রঙ্গলাল পরামানিক আদালতে বলল,

—শিবলালের মৃতদেহের পাশে বসে কয়েক মিনিট আমি কেঁদেছি—অঝোরে, বন্ধুত্বের ঋণ— দু-ফোঁটা চোখের জলেই শোধ করতে চেয়েছিল।

আর মহামায়া?

তার জীবনের ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বয়ে সে ছিল ক্লান্ত। রিক্ত। সে শিবলালকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রঙ্গলালের স্মৃতি সে একেবারে ভুলে যায়নি। তাই রঙ্গলালের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগই ছিল না।

সব কিছুকেই সে ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। পৃথিবীতে বেঁচে

থাকা মরে যাওয়া সবই তার কাছে একটা প্রচণ্ড কৌতুক। মৃত্যু তার কাছে রোমাঞ্চ নয়—জীবনের মাধুর্য্যও শিথিল।

তাই রঙ্গলাল পরামানিক জিততে চাইলেও স্কোর বোর্ডে সে হেরেই গেছে।

এলাহাবাদে সে রাত্রেও সে হেরেছিল, আর আদালতের কাঠ গড়াতেও আবার সে হারল।

তার প্রাণদণ্ড হল।

হয়। কাজেই বিবাহ-ব্যাপারে আর কোনও বাধা পড়িল না। ভারতবর্ষের রাজা একটা মস্ত সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্রে সাজাইয়া আনিলেন, আর পরীগণ ও দৈত্যেরা আর এক দল দিল। তখন তাঁহারা সকলে পারস্যের দিকে যাত্রা করিলেন। কাসবের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্য আক্রমণ করিতে সৈন্যদল আসিতেছে শুনিয়া কাসব টাকা দিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং কিছুক্ষণ বৃথা যুদ্ধ করিয়া হত হইল। পরীরা তাহার মাথা ও শরীর পারস্যের রাজাদের সমাধি-স্থল সেই মাটির নীচের ঘরে লইয়া গেল, আর পূর্ব্বে যেখানে রাজার মাথা ঝুলান ছিল, ঠিক সেইখানে তাহার মাথাটা ঝুলাইয়া দিল। গামলার জলে এক ফোঁটা করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, আর বিকটমূর্ত্তি এক-একটা ব্যাঙ হইয়া অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিষ ও দুর্গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।

—শেষ—

শান্তা দেবী সীতা দেবীর আর একখানি বই

সাত রাজার ধন

সীতা দেবীর দুখানি বই

সিক্রেট গুরুর কাহিনী ও অন্যান্য গল্প

আজব দেশ ও অন্যান্য গল্প